মিথ্যার জয়!

ও

আরো কয়েকটি

ছোট গল্প

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, এম্‌-এ, বি-এল্‌

এম্‌, সি, সরকার এণ্ড্‌ সন্স্‌ লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

১৩৪২ মূল্য—১৷৷০

সূচী

মিথ্যার জয়!

১

আমাদের দেশের লৌকিক শাস্ত্রে একটা মৌখিক সূত্র আছে—'চুরি-বিদ্যে বড় বিদ্যে।' কোন অখ্যাতনামা টীকাকার তাহার উপর কলম চালাইয়া টিপ্পনী কাটিয়াছেন—'যদি না পড়ে ধরা।' অর্থাৎ, কেবল চুরি করিলেই হয় না, তাহার সঙ্গে চাই—ধরা না পড়া। এখন এই ধরা না পড়ার উপায় কি? ইহার একমাত্র সর্ব্ববাদীসম্মত উপায়—মিথ্যা। চুরি করিয়া যদি মিথ্যা না বল ত ডুবিলে। আর যদি মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়া চুরিটাকে ঢাকা দিয়া ফেলিতে পার, তখন সকলে বলিবে—চুরিটাই মিথ্যা, আর সব সত্য। সুতরাং জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মতই প্রমাণ হইয়া গেল যে চুরি অপেক্ষা মিথ্যাই বড়।

চুরি করিলে মিথ্যা বলা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে বটে; কিন্তু চুরি না করিয়াও লোকে কেন যে রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলে তাহা ভাবিয়া পাই না।

এই ধরুন না, আমাদের নটবর দত্ত। নটবর—ঐ যে বৌবাজারে বৃন্দাবন দাসের গলির ঠিক মোড়ের বাড়ীটায় থাকে,—ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে ছোকরাটি, মুখে সদাই হাসি লাগিয়া আছে, যেমন মিশুক তেমনই 'বক্তার', অচেনা লোকের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের আলাপেই গলাগলি ভাব করিয়া ফেলে—সেই নটবর।

সকালে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত একচোট ঘুরিয়া আসিয়া, বৌবাজারের মোড়ে ব্যস্ হইতে নামিয়া ফুটপাথে উঠিতেই নটবর হয় ত দেখিল, ভৃত্য মধুস্দন বাজার করিয়া বাহির হইতেছে। ঠিক সেই সময়ে যদি কেহ বলে—"কি হে, নটবর যে, কদ্দূর ঘুরে এলে?" নটবর অমনি অবসন্ন ভাবে হাত দু'খানি এলাইয়া দিয়া, ভৃত্যকে দেখাইয়া বলিবে—"এই ভাই, ঘুরে ঘুরে বাজার করে এই ফিরৃছি;—আর কেন বল দাদা, সংসারের জন্যে খেটে খেটে—"

এই কু-অভ্যাসের জন্য তাহাকে চাপিয়া ধরিলে সে বলে—"বোঝ না ভাই, এটা ত আর সত্যযুগ নয়, যে যা' বল্‌বে লোকে বিশ্বাস করবে। যদি দশটা খাঁটি সত্যি কথা বল, লোকে বল্‌বে, এর মধ্যে একটা কথা সত্যি হ'লেও হ'তে পারে—বাকি সব মিথ্যে। দরকার কি, তা'র চাইতে সব মিথ্যে কথাই বল্লুম—লোকে তার মধ্যে অন্ততঃ একটাকেও সত্যি ভাব্‌বে। মনে রেখো এটা কলিকাল; একালে 'সত্যের জয়' বলা চলে না—এখন মিথ্যার জয়!"

বাহিরের লোকের সঙ্গে যাই করুক, হতভাগা তাহার স্ত্রীর কাছে পর্য্যন্ত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা বই সত্য বলে না। বলে—"জান না—স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ!"

২

নটবরের বৌ সুষমা মেয়েটি বেশ—সাতেও নাই পাঁচেও নাই, মনটি খুব সরল। স্বামীর উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস,—এই তিন বৎসর ধরিয়া তাহার মিথ্যা কথাগুলাকে নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ক্রমে সে সেয়ানা হইতেছে। তাই এখন মাঝে মাঝে তাহার নির্ম্মল হৃদয়াকাশে সংশয়ের ছোট ছোট মেঘ কোথা হইতে ভাসিয়া আসে।

নটবরের প্রধান দোষ—সে অতিমাত্রায় আড্ডা-বাজ। থিয়েটার, সিনেমা, তাস-পাশার মজলিস, গার্ডেন-পার্টি, সঙ্গীতের জল্‌সা—এই সমস্ত লইয়াই সে মাতিয়া থাকে। তাহার মা-বাপ নাই, ছেলেবেলা হইতে পিসিমাই তাহার একমাত্র অভিভাবিকা। এই রকম করিয়াই যে ছেলেরা কুসঙ্গে পড়িয়া অধঃপাতে যায়, পিসিমা তাঁহার শ্বশুরকুলের দৃষ্টান্ত হইতে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছেন। তাই তিনি সুষমাকে ঘরে আনিয়া একটা প্রবল কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। আশানুরূপ ফলও ফলিল। কিন্তু এই নূতন নেশার মোহ যেমন নটবরের 'গা-সওয়া' হইয়া আসিল, পুরাতন নেশা আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। পিসিমা এ পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন—যতই ফড়্ ফড়্ কর, পায়ে শিকলি বাঁধা আছে—কত আর উড়্‌বে!

সুষমাও যে ইহা লক্ষ্য করে নাই তাহা নয়, কিন্তু পরিবর্ত্তনটা বুঝিবার তেমন অবসর পায় না। নটবর রাত্রে বাড়ী আসিয়া এমন রং ফলাইয়া অলঙ্কার দিয়া নানারূপ বর্ণনা আরম্ভ করে, যে তাহার বিপুল উৎসাহ এবং আনন্দ দেখিয়া সুষমা তাহার দীর্ঘ নিঃসঙ্গ দিবসের ক্লেশ ভুলিয়া যায়—স্বামীর সুখেই ত স্ত্রীর সুখ!

দিনের বেলা সময় কাটাইবার জন্য সুষমা বিস্তর নাটক-নভেল পায়—নটবর নানা স্থান হইতে সে সব যোগাড় করিয়া আনে। এই সব বই পড়িতে পড়িতে এক এক সময়ে সুষমার বক্ষ কাঁপিয়া উঠে। নটবরের চেহারা বড় সুন্দর; তাহার মুখের হাসি, চোখের চাহনি বড় মধুর, তাহার কথা কহিবার ভঙ্গী অপূর্ব্ব—মন-মুগ্ধকর। সুষমা ত এই সব দেখিয়াই তাহার সারা দেহপ্রাণ নটবরের চরণে লুটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সে ভাবে, আর পাঁচটা মেয়েও ত এইরূপে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে—নাটক-নভেলের মেয়েদের মত।

নটবর রাত্রে ফিরিয়া আসিলেই কিন্তু সমস্ত সংশয় ঘুচিয়া যায়। যেদিন রাত্রি বেশী হয়, সুষমা একটা ঈর্ষার অস্পষ্ট জ্বালা অনুভব করে। কিন্তু ঠিক সেইদিনই নটবরের আদর-সোহাগের মাত্রা বাড়িয়া যায়। সুষমা সব ভুলিয়া গিয়া ভাবে—হয়ত এই রকম দেরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়!

ওদিকে কিন্তু নটবরের দিনগুলা বেশ কাটে। অন্নচিন্তা নাই, বাড়ীখানি নিজের, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, একটা হার্ডওয়ারের কারবারের অংশ আছে—তাহারও আয় মন্দ নয়। দ্বিপ্রহরে আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া, 'অফিস যাই' বলিয়া প্রত্যহই সে বাহির হয়। অফিসে একবার যায়—এ কথাটা কিন্তু সত্য। তবে অফিসের কাজ সে মোটেই বোঝে না, দু-পাঁচটা বাজে গাল-গল্প করিয়াই সে সরিয়া পড়ে।

অফিসটি কিন্তু নটবরের পক্ষে কল্পতরু বিশেষ। ইহার আয়ের কথা বলিতেছি না—অফিসের দোহাই দিয়া সময়ে-অসময়ে ইচ্ছামত বাড়ী হইতে বাহির হওয়া যায়। সুষমার বিশ্বাস, নটবর না গেলে অফিস অচল হইয়া বসিয়া থাকে!

এই অফিসের কাজের ছুতা করিয়া নটবর কত হিল্লি-দিল্লীও ঘুরিয়া আসিয়াছে। একবার কিন্তু বড় মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল—নটবর এবং সুষমা দুজনকেই।

৩

সেবার নটবরের দলবল সহ বোম্বাই যাইবার মৎলব। বাড়ীতে কিন্তু প্রকাশ—সে অফিসের কাজে একাই যাইতেছে। সব যখন ঠিক, তখন সুষমা ধরিয়া বসিল—সেও সঙ্গে যাইবে। অত বড় সহর, কলিকাতা অপেক্ষাও নাকি বড় এবং দেখিতে সুন্দর। তাহার উপর পিসিমার সুপারিস। অগত্যা সুষমাকে লইয়া যাইতে হইল। নটবর তাহার সঙ্গীদের সাবধান করিয়া দিল—সুষমা যেন তাহাদের দেখিয়া না ফেলে। কারণ নটবরের বাড়ীতে মাঝে মাঝে গান-বাজনার মজলিস হইলে ইহারা প্রায়ই আসে, সে জন্য সুষমা তাহাদের অনেককে চেনে।

বোম্বাই সহরে বাঙ্গালীদের থাকিবার জন্য একটা 'বান্ধব-নিকেতন' আছে অনেকেই জানেন। নটবরের দল সেইখানে গিয়া উঠিল। কিন্তু সুষমাকে লইয়া সে বেচারীর আর সেখানে থাকা চলে না। কাজেই ভাটিয়াদের একটা হোটেলে আশ্রয় খুঁজিয়া লইল। সেখানে খাইবার বিষম কষ্ট। নটবর মাঝে মাঝে বাহিরে মুখ বদ্‌লাইয়া আসে, কিন্তু অনভ্যস্ত আহারে সুষমার পেটে চড়া পড়িবার উপক্রম।

নটবর দিনের বেলায় 'অফিসের কাজে' বাহিরে বাহিরে ঘোরে, বৈকালে ফিরিয়া কিছুক্ষণ সুষমার কাছে থাকে। এক একদিন তাহাকে

লইয়া একটু বেড়াইয়া আসে। কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহাকে আবার বাহির হইতে হয়। বলে—"দিনের বেলা কাজের ভিড়ে বড় বড় ব্যবসাদারদের সঙ্গে কি ভাল ক'রে কথা কইবার জো আছে! রাত্রে নিরিবিলিতে—"

আসল কথা অবশ্যই তাহা নহে। নটবরের দলে এক জন বিখ্যাত 'চাণক্য' আছে; তাহাকে এবং আরও দুই-চারজনকে লইয়া স্থানীয় নাট্য-সমিতি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল, এবং কয়দিন তাহারই মহলা চলিতেছিল।

নটবরের কিন্তু নিজের অভিনয় করিবার সখ ছিল না। সে চঞ্চল প্রকৃতির লোক, দিনের পর দিন একঘেয়ে রিহার্স্যল দেওয়া তাহার পোষায় না। আর, সেই যে গেঞ্জি-পরা মালকোঁচা-আঁটা নায়িকার হাত ধরিয়া প্রণয়-নিবেদন করিতে হইবে—তাহা ভাবিলেও অঙ্গ জ্বলিয়া যায়! 'নেবুতলা নাট্য-পরিষদের' সে একজন উদ্যোগী সভ্য বটে, কিন্তু রিহার্স্যলের ধার ধারে না। মাঝে মাঝে যাইয়া কেবল আসর সরগরম করে, আর খেয়াল হইলে একটু আধটু বাজায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলাতে নাকি তাহার বেশ হাত খেলে।

বোম্বাই গিয়াও সেই রিহার্স্যলের পালা আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পর একটু আড্ডা দিয়া আসিবার জন্য নটবর ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভালও লাগে না। ফিরিয়া আসিয়া সুষমাকে বুঝায়—"তোমাকে এমন একলা ফেলে রেখে কি বেশীক্ষণ থাকতে পারি, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। কাজের ক্ষতি হ'বে? ক্ষতি আর কি, না হয় একটু দেরি হ'বে—দশদিনের জায়গায় না হয় পনেরো দিন।"

একদিন বৈকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়া সুষমা বলিল আজ একটু দেরি করিয়া ফিরিবে। তিথি ছিল পূর্ণিমা। সুষমা বলিল—চাঁদের আলোয় সমুদ্র নাকি বড় সুন্দর দেখায়; এ দৃশ্য সে না দেখিয়া ফিরিবে না। সুষমার আব্দার করা স্বভাব নয়; কিন্তু যখন ধরিয়া বসে, কিছুতেই ছাড়ে না। নটবরও বেশী আপত্তি করিল না।

দুজনে মিলিয়া জ্যোৎস্নালোকিত অনন্তপ্রসারিত জলরাশির অমল শোভা দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল, কাহারও জ্ঞান ছিল না। সুষমাই শেষে স্মরণ করাইয়া দিল—এইবার ফিরিতে হইবে।

একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সিকে ধরিবার জন্য নটবর একটু অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে তিন-চারজন লোক তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল—"আরে নটবর! এখানে ঘুরে বেড়াচ্চো! পরশু প্লে, মনে নেই বুঝি? গঙ্গাধরের অসুখ—আজ তোমাকেই বাজা'তে হ'বে। হোটেলে তোমার সন্ধান পাওয়া গেল না—সারা সহর খুঁজে বেড়াচ্চি—"

নটবর যেন কি রকম হইয়া গেল। অদূরবর্ত্তিনী সুষমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নস্বরে বলিল—"আজ এঁর বড় মাথা ধরেছিল, তাই একটু বেড়া'তে এনেছিলুম।"

তাহারা একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়াই চোরের মত সরিয়া পড়িল।

ইহাদের রকম দেখিয়া সুষমা হাসিয়া ফেলিল। ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"এরা সেই নেবুতলার দল নয়? এখানে—"

নটবর রাগে ফুলিতেছিল, বলিল—"হ্যাঁ, আর কেন বল—হতভাগারা

এসে জুটেছে, এই ক'দিন হ'ল। ওদের ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—হুজুগ নিয়েই আছে। আবার আমার উপর তম্বি! দয়া করে দু'দিন ওদের রিহার্সলে বাজিয়ে এসেচি বলে আমার যেন মাথা বিকিয়ে গেছে—এই রাত্তিরে চল বাজাতে!"

সুষমা বলিল—"আহা, তা যাওই না একবার। এমন ত কিছু বেশী রাত হয়নি। আর তুমি নাকি বাজাও ভাল, তাই ত বলে।"

নটবরের কিন্তু কিছুতেই রাগ পড়িল না। সে রাত্রে সে সত্য-সত্যই বাহির হইল না।

শুধু তাহাই নয়—রাগের মাথায় সে বলিয়া বসিল, কালই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। আফিসের কাজ শেষ হইয়াছে, চ্যাংড়াদের পাল্লায় পড়িয়া আর কতদিন এখানে বসিয়া থাকিবে!

সুষমা অনেক বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিল—তাহার অভাবে যদি অভিনয়ের সময় কোন বিশৃঙ্খলা হয়, লোকে তাহারই দোষ দিবে; সেটা ভাল কথা নয়—না হয় ফিরিতে দু'দিন দেরীই হইবে ইত্যাদি।

অভিনয়ের রাত্রে সুষমা একরকম জোর করিয়াই থিয়েটার দেখিতে গেল। নটবর বলিয়াছিল, সেখানে তাহার অনেক কষ্ট এবং অসুবিধা হইবে। দেখিল তাহাই বটে। অভিনয় আরম্ভ হইতে অযথা বিলম্ব হইতেছিল, অচেনা লোকের মাঝে একাকী বসিয়া প্রান ওষ্ঠাগত। নটবর একবার মাত্র আসিয়া গোটাকতক পান দিয়া গেল। তাহার পর তাহার আর দেখা নাই।

শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় নাট্য-সমিতির সম্পাদক ষ্টেজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া একটি বক্তৃতা দিয়া গেলেন। গোড়ার

কথাগুলা হট্টগোলের মধ্যে ভাল শোনা গেল না। উপসংহারে তিনি বলিলেন—"আজকের এই অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত কর্‌বার জন্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়েরা বিলক্ষণ ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করে সুদূর কলিকাতা হ'তে এসে আমাদের যেরূপ সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেছেন, তা'র জন্যে সমিতির পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌চি।"

নটবরের নাম শুনিয়া সুষমা প্রথমটা বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। কিন্তু একটা সংশয় আসিয়া জুটিল—নটবর কি তবে এই থিয়েটারের জন্যই বোম্বাই আসিয়াছে নাকি? অফিসের কাজ কি সব মিথ্যা? কে জানে! নটবরকে জেরা করিয়া সত্য কথা বাহির করা যে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অসাধ্য, সুষমা তাহা একটু একটু বুঝিত, তাই সে বিষয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা করিত না।

তথাপি হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া সুষমা একটু কপট হাসি হাসিয়া বলিল—"যাই হ'ক, থিয়েটারের জন্যে এত 'ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করে সুদূর কলিকাতা হ'তে' যে এসেছিলে তা কতকটা সার্থক হ'ল।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নটবর বলিল—"আরে রাম বল! থিয়েটারের জন্যে আমি—আমার যেন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—ও সব ফাঁকা খোসামুদি, বুঝ্‌লে না? আমি এলুম কিনা নিজের অফিসের কাজে—ফাঁক্‌তালে একটু নাম হয়ে গেল। আমি ত আগেই চলে যাচ্ছিলুম, তুমি বল্‌লে বলেই দুটো দিন থেকে যাওয়া। কিন্তু আর না—চল, কালই রওনা—কি বল?"

৪

বোম্বাই হইতে ফিরিয়া অবধি সুষমা নটবরকে পদে পদে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল। একটু জেরা না করিয়া তাহার কোন কথাই আর বিশ্বাস করিতে চাহে না। সুতরাং নটবরকে এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাল-মশলারও সংগ্রহ হইতে লাগিল।

চাঁপাতলায় তাহার এক বন্ধুর একটা ছোট ছাপাখানা আছে, তাহাতে 'বিজ্ঞাপন, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, বিল, চেক-দাখিলা প্রভৃতি অতি সত্বর ও সুলভে ছাপা হয়'। নটবর তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিল—ছাপাখানায় যত নিমন্ত্রণ পত্র এবং প্রীতি-উপহার ছাপা হয়, একখানি করিয়া তাহাকে দিতে হইবে। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি রীতিমত লেফাফা-ভুক্ত হইয়া শয়ন-কক্ষের টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত হইয়া প্রায়ই সুষমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নটবরও ঘন ঘন নিমন্ত্রণে যায়—অধিকাংশই বিবাহের বা প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণ—এবং ফিরিয়া আসিয়া পকেট হইতে দুই-একখানা প্রীতি-উপহারও বাহির করিয়া দেয়। না চাহিতেই এইরূপ অকাট্য প্রমাণ দাখিল করিয়া নটবর জেরার পথ বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু ইহাতেও বিপদ আছে। একদিন—সেদিন শুক্রবার, ৪ঠা আষাঢ়—নটবর অসন্দিগ্ধ চিত্তে একখানা প্রীতি-উপহার বাহির করিয়া দিল। সুষমা দেখিল তাহাতে তারিখ দেওয়া আছে—শুক্রবার ১১ই আষাঢ়। প্রথমে সে কিছু বলিল না। কনেটির বয়স কত, দেখিতে কেমন, বর কি করে, কোথায় বাড়ী, কত বয়স, ক'টার সময় লগ্ন, ইত্যাদি

প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর শুনিয়া শেষে বলিল—"কিন্তু বিয়েটা এক হপ্তা আগে হয়ে গেল কেন ?"

নটবর আকাশ হইতে পড়িল—"এক হপ্তা আগে ! মানে ?"

"মানে খুব সোজা—এতে বিয়ের তারিখ ছাপা রয়েছে ১১ই আষাঢ়, কিন্তু আজ ত ১১ই নয়—৪ঠা।"

"কই দেখি"—বলিয়া নটবর কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"ও কিছু নয়—ছাপার ভুল। বারটা ঠিক আছে ত—শুক্রবার।"

সুষমা একবার স্থির দৃষ্টিতে নটবরের মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পিসিমার ঘর হইতে পাঁজি আনিয়া হাজির করিল। 'শুভদিনের নির্ঘণ্ট' বাহির করিয়া দেখাইল—১১ই আষাঢ় বিবাহের দিন আছে, ৪ঠা আষাঢ় নাই !

নটবর কিছু না বলিয়া নীরব আক্রোশে তাহার ছাপাখানার বন্ধু জিতেন রাস্কেল্‌টার মস্তক চর্ব্বন করিতে লাগিল—তাহারই ত দোষ !

সে যাত্রা নটবর কিরূপে রক্ষা পাইল জানি না। তবে লক্ষ্য করিয়াছি তাহার পর হইতে তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে হইত এবং নিমন্ত্রণের সংখ্যাও যেন ক্রমশঃ কমিয়া আসিল।

৫

ইতিমধ্যে নটবরের দলে একটা নূতন হুজুগ উঠিল—একবার রেঙ্গুন বেড়াইয়া আসিতে হইবে। নটবরের প্রধান ভাবনা হইল সুষমাকে লইয়া—যাহাতে সেবারকার মত তাহাকেও স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে না হয়।

যাইবার অবশ্য বিলম্ব আছে, কিন্তু সময় থাকিতে জমির পাট না করিলে ইচ্ছানুরূপ ফসল হইবে কেন?

নটবরের উর্ব্বর মস্তিকে সহজেই একটা বুদ্ধি অঙ্কুরিত হইল, এবং অবিলম্বে তাহার গোড়াপত্তন হইয়া গেল।

রাত্রে সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার গলায় একগাছা জুঁই ফুলের ডবল্ গোড়ে।

বিজয়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া সে বলিল—"দেখ্‌চ? কে পরিয়ে দিয়েছে জান?"

সুষমার মনে সদা-সর্ব্বদা আশঙ্কা, নটবরকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য নানাদিক হইতে চেষ্টা চলিতেছে। তাই সে চমকিয়া উঠিল। ভাবিল এ কি কোন প্রেমিকার প্রণয়-উপহার নাকি? আর তাহার এই গৌরব-কাহিনী আমাকে শুনাইতে চাহে! এতদূর নির্লজ্জ! ছি!

নটবর বলিল—"খোদ্ সোমেশ্বর ভাদুড়ি স্বহস্তে এই মালা পরিয়ে দিয়েছে।"

সুষমা বলিল—"সে আবার কে?"

"জান না? সোমেশ্বর ভাদুড়ির নাম শোননি?—আশ্চর্য্য! মস্ত বড় গাহিয়ে এই সোমেশ্বর ভাদুড়ি। কল্‌কাতা সহরে—শুধু তাই কেন, সারা বাংলা দেশের মধ্যে—এত বড় গুণী আর একটি নেই।"

এখানে জনান্তিকে বলিয়া রাখি, এই সোমেশ্বর ভাদুড়ি নটবরের নিছক কল্পনা-প্রসূত।

নটবর বলিয়া চলিল—"সোমেশ্বর বাবুর সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ। কিন্তু এই একদিনের পরিচয়ে তিনি আমাকে এতদূর ভালবেসেছেন,

যে কি বল্‌ব ! আজ কুমার মনীন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ীতে গানের আসর হয়েছিল কিনা—আমিও ছিলুম। সোমেশ্বর বাবু খান পাঁচেক গান গাইলেন। শেষের দিকটায় আমি একটু বাজিয়েছিলুম। একটা গান যখন শেষ হয়েছে, আমিও তেহাই মেরে যেই ছেড়েচি, সোমেশ্বর বাবু অমনি তানপুরাটা ফেলে দিয়ে, নিজের গলা থেকে মালা খুলে আমায় পরিয়ে দিলেন। বল্‌লেন—এই রকম সঙ্গত পেলে তবে ত গান জমে। শুধু নিজের কেরদানি দেখালেই ত হয় না। আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, নটবর বাবু। আর একটু সাধনা দরকার, তা হ'লেই সিদ্ধি।"

স্বামীর প্রশংসা শুনিলে কোন্ পতিপরায়ণা নারীর প্রাণ নাচিয়া না উঠে? একটা প্রবল আনন্দের উচ্ছ্বাসে সুষমার হৃদয় ভরিয়া গেল। নটবরের শেষ কথার উত্তরে সে বলিল—"তা বেশ ত, অত বড় লোকটা যখন বল্‌চে, একটু ভাল ক'রেই চর্চ্চা কর না।"

নটবর ঠিক এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া একটু বিষণ্ণ ভাবে উত্তর করিল—"তা' কি ক'রেই বা হয়, তা'র জন্যে সময় চাই, পাঁচটা মজলিসে আসা-যাওয়া চাই। কিন্তু তুমিও আমাকে বেশীক্ষণ ছেড়ে থাক্‌তে পার না, আমিও পারি না।"

সুষমা অনেক খোসামোদ করিয়া, মাথার দিব্য দিয়া, নটবরকে রাজী করাইল যে সে এইবার রীতিমত সঙ্গীত-সাধনায় মনোযোগী হইবে।

তা'রপর দিনকতক বেশ যায়। নটবরকে আর প্রত্যহ বাড়ী আসিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। বিবাহের নিমন্ত্রণও আর বেশী হয় না। মাঝে মাঝে সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথা উঠে—কবে কোথায় গাওনা হইল, নটবরের কিরূপ তারিফ্ হইল, এই সব।

মাসখানেক পরে একদিন নটবর মুখখানি বিমর্ষ করিয়া বাড়ী ফিরিল। দেখিয়া সুষমা বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। নটবরকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"সোমেশ্বর বাবু আজ বল্‌ছিলেন, তাঁ'কে একবার রেঙ্গুন যেতে হ'বে, দিন কতকের জন্যে ; সেখানে 'নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলন' হ'বে কিনা—দেশের যত বড় বড় কলাবিদ্ সেখানে জমায়েৎ হ'বে। সোমেশ্বর বাবু আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু—"

সুষমা বলিল—"কিন্তু আর কি, যাওই না—এত বড় সুযোগ—"

"তা' ত, কিন্তু অত দূর, আর দেরী হ'য়ে যা'বে অনেক—মাসখানেক ত বটেই। তা' ছাড়া এবার ত আর তোমাকে নিয়ে যাওয়া চল্‌বে না—এখানে একলাটি অতদিন ফেলে রেখে যাওয়াও......। তাই বল্‌লুম আমার আর বোধ হয় যাওয়া ঘটে উঠ্‌বে না।"

"না না, তুমি যাও, আমার কোন কষ্ট হ'বে না। হ'লেও, তোমার যদি এতে একটু যশ হয়—"

"সামান্য একটু যশের জন্যে তোমাকে এতটা কষ্ট দেওয়া—"

সেদিন এই পর্য্যন্ত, বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত হইল না। তা'রপর নটবর এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। শেষে সুষমাই একদিন আবার কথাটা উত্থাপন করিল, এবং অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে নটবর রেঙ্গুন যাইবে, এবং সুষমা সেই অবসরে একবার শান্তিপুরে তাহার পিত্রালয়ে বেড়াইয়া আসিবে।

৬

নটবরের দল যথাসময়ে তুমুল উৎসাহে রেঙ্গুন যাত্রা করিল এবং মহা আনন্দে একটি মাস কাটাইয়া কলিকাতায় ফিরিল।

সুষমা পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। নটবর কয়েকদিন ধরিয়া তাহাকে রেঙ্গুনের বৃত্তান্ত সবিস্তারে শুনাইল—মুক্ত সমুদ্রের দৃশ্য, রেঙ্গুন সহরের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান, সেখানকার অধিবাসীগণের বিচিত্র বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। 'নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের' রিপোর্টও দাখিল হইল, সেই সঙ্গে সোমেশ্বর ভাদুড়ি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ওস্তাদ্‌গণের গুণের তারিফ্ হইল—নটবরের নিজের ভাগেও তাহার কিছু কিছু অংশ পড়িল।

তখন হইতে রাত্রে ফিরিতে বিলম্ব হইলে প্রায় সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথাই উঠে, নটবরকে আর নিত্য নূতন নূতন গল্প রচনা করিয়া তাহার অসাধারণ কল্পনাশক্তির অপচয় করিতে হয় না।

সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথা শুনিতে শুনিতে সুষমার মনে এই অতি-প্রশংসিত লোকটিকে দেখিবার জন্য প্রবল কৌতূহল জন্মিল। নটবরকে এ কথা বলিতে সে একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"তা'র আর কি—একদিন দেখিয়ে দেবো 'খন।"

আজকাল নটবর প্রায়ই থিয়েটার-সিনেমা দেখিতে যায়, মাঝে মাঝে সুষমাকেও সঙ্গে লয়। আবার ঠাকুর-দেবতার একটু নাম-গন্ধ থাকিলে পিসিমাকেও এক-একদিন দেখাইয়া আনে।

একদিন নটবর সুষমার সঙ্গে থিয়েটার দেখিয়া ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে একখানা মোটর ধীরে ধীরে তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। নটবর সেই মোটরের আরোহীর উদ্দেশে হাত

তুলিয়া নমস্কার করিয়া বার কয়েক নানা ভঙ্গীতে মাথাটি নাড়িয়া, সুষমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া বলিল—"উনিই সোমেশ্বর ভাদুড়ি।"

সুষমার সেদিকে নজর ছিল না, চকিতে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"ঐ তোমার সোমেশ্বর ভাদুড়ি? ও যে বিট্‌কেল চেহারা—কালো, মোটা—দেখ্‌লে ভক্তি হয় না।"

"আরে না না, সোমেশ্বর বাবু খুব সুপুরুষ লোক। তুমি তবে আর কা'কে দেখে থাক্‌বে—ড্রাইভারটাকে হয়ত।"

"কে জানে, তা-হ'বে।" সুষমার কৌতূহল-নিবৃত্তি আর হইল না।

একদিন সুষমা বলিল—"আচ্ছা, আমাদের বাড়ী ত গান-বাজনা মাঝে মাঝে হয়, একদিন সোমেশ্বর বাবুকে আননা। অত বড় গাহিয়ের গান ত কখনও শুনিনি—একবার শোনা যাক্।"

নটবর চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—"আরে বাস্ রে! সোমেশ্বর বাবু আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে গাইতে!—তাঁ'কে কি এমনই হেঁজিপেজি লোক পেয়েছ? কত বড় বড় লোক তাঁর গান শোন্‌বার জন্যে খোসামোদ করে—"

"তা হলেই বা, তোমাকে যখন অত ভালবাসেন—এ খাতিরটা আর রাখ্‌বেন না একবার? তোমার কাছে যে রকম শুনি তা'তে লোক ত ভাল বলেই মনে হয়।"

"লোক খুব অমায়িক। কিন্তু, হ'লে হ'বে কি, তাঁ'র মোটে সময় নেই। আচ্ছা দেখি—কিন্তু না—তা'ই বা কি ক'রে হয়—"

"তা হোক, তুমি একবার বলে দেখ না। তাঁর যেদিন সুবিধা হয়—আমাদের ত কোন তাড়াতাড়ি নেই।"

নটবর সেদিনকার মত 'হতগজ' করিয়াই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল। কিন্তু বড় দুর্ভাবনায় পড়িল। যে লোকটার অস্তিত্বই নাই তাহাকে আনিয়া আসরে নামাইবে কিরূপে ?

সুষমা মাঝে মাঝে তাগাদা করে, কিন্তু নটবরের কোন উৎসাহই দেখা যায় না। শেষে একদিন বলিল—"সামনের বুধবারে সোমেশ্বর বাবু আস্‌চেন। ওঃ কি করে যে তাঁ'কে রাজী করেছি, কি বল্‌বো !"

মহা উৎসাহে সুষমা এই সম্ভ্রান্ত অতিথির উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিয়া গেল।

মঙ্গলবার রাত্রে নটবর বাড়ী আসিয়া হতাশ ভাবে বলিল—"হ'ল না—সোমেশ্বর বাবু আজ সকালে পাঞ্জাব মেলে লক্ষ্ণৌ চলে গেছেন। সেখানে কোন্ এক নবাবের ছেলের বিয়ে—খুব ধুম-ধাম, নানা দেশ থেকে বড় বড় গাহিয়ে সব আস্‌চে—সোমেশ্বর বাবুকে না নিয়ে গেলেই নয়। নবাবের তিনজন কর্ম্মচারী আজ দশদিন ধরে সোমেশ্বর বাবুকে নিয়ে যা'বার জন্যে ঝুলোঝুলি। আগেই বলেছিলুম, আমাদের মতন লোকের ঘরে কি তাঁ'র আসা ঘটে !"

সুষমার মনটা বড় দমিয়া গেল। কিন্তু সে হাল ছাড়িবার পাত্রী নয় ; বলিল—"দেখ, তিনি ফিরে আসুন, তা'রপর একবার বেশ ভাল ক'রে তাঁ'কে ধর্‌তে হ'বে। আচ্ছা, যদি এক কাজ করা যায় ?—রাগ না কর ত বলি।"

নিতান্ত উদাস ভাবে নটবর বলিল—"বল।"

"আমি বলি কি, তিনি ত আমাদের চেয়ে ঢের বয়সে বড়, ব্রাহ্মণ—আমি যদি একখানা চিঠি লিখি তাঁ'কে, তুমি নিয়ে গিয়ে দেবে ; লিখ্‌বো—

আপনার কথা অনেকদিন থেকেই শুন্‌চি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শ্রীচরণের দর্শন পেলুম না; তা, একবার আপনার এই গরীব মেয়েটিকে পায়ের ধূলো দিতে আস্‌বেন না?—এই রকম করে একটু গুছিয়ে—তুমিই না হয় লিখে দেবে। কি বল? তা' হ'লে বোধ হয় তিনি নিশ্চয় আসেন।"

নটবর তেমনই উদাস ভাবে উত্তর করিল—"তা দেখ্‌লে হয়।"

বেচারীর তখন মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে সে আর কি বলিবে? সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

নটবর দেখিল, এমন করিয়া আর চলিবে না। সোমেশ্বর ভাদুড়ির কল্যাণে এতদিন বেশ নির্ভাবনায় কাটিয়াছে; কিন্তু সেই সোমেশ্বর ভাদুড়িই ক্রমে বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় কি? নটবর অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে ইহার একটি মাত্র উপায় আছে—মৃত্যু! সোমেশ্বর ভাদুড়িকে এইবার মরিতে হইবে—নতুবা তাহার জীবনে শান্তি নাই। যাহার নিকট এত উপকার পাইয়া আসিয়াছে, হয়ত আরও কত পাওয়া যাইত, তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বড় কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'—শাস্ত্রের বচন। তাই নটবর আত্মরক্ষার্থে অনন্যোপায় হইয়া তাহার মানস-সন্তানকে স্বহস্তে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

৭

দিন-দশ পরে নটবর বাড়ি আসিয়া বলিল—"শুনেচ, সোমেশ্বর বাবুর বড় অসুখ।"

সুষমা ব্যথিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আহা, কি হয়েচে ?"

"হয়েচে খুব শক্ত ব্যারাম। লক্ষ্ণৌ গিয়ে হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। তাড়তাড়ি চলে এলেন। এখানে ডাক্তার-কবিরাজ দেখ্‌চে। তা'রা বলে রোগ বড় শক্ত, আগে থেকেই এর সূত্রপাত হয়েচে, এতদিন জানা যায় নি—এখন কি হয় বলা যায় না। যে রকম ছুটাছুটি টানা-পড়েন আরম্ভ হয়েছিল—শরীরের উপর খুবই ধকল পড়্‌ছিল ; এতে কি করে আর স্বাস্থ্য থাকে মানুষের। আমাদের দেশে আজকাল গুণের আদর করুতে শিখেচে বটে, কিন্তু গুণের আদর করুতে গিয়ে যে গুণীর প্রাণ যায় সে জ্ঞান ত নেই ! দেখ, এখন কি হয়।"

নটবর প্রত্যহ সুষমাকে সোমেশ্বর বাবুর সংবাদ আনিয়া দেয়। একদিন অনেক রাত্রে ফিরিয়া একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"এত ক'রেও বাঁচানো গেল না সোমেশ্বর বাবুকে।" তারপর সুষমার উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলিল—"হয়ে গেল—আজ এইমাত্র দেখে আস্‌চি। আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। আর থেকেই বা কি করুবো—আমরা ত আর কাঁধ দিতে পা'ব না। আহা ! লোকটি বড় ভাল ছিল, আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন।"

হিসাবে নটবরের প্রায় ভুল হয় না। ঠিক দশদিন পরে সোমেশ্বর বাবুর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। নটবর শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে খাটিতে গেল। ফিরিতে রাত্রি বেশী হইবারই কথা—বলিয়া গেল।

সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার সময় নটবরের পিস্‌তুত ভাই—আর এক পিসীর ছেলে—জ্যোতিষ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। সে তাহার মাসীর সহিত একটু গল্প-সল্প করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, তিনি বলিলেন—"তোর বৌদিদির সঙ্গে দেখা করে যাবি না ?"

"ও, বৌদি' আছেন উপরে ? আমি বলি বুঝি—"

ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া জ্যোতিষ বলিল—"আরে বৌদি,' আপনি এখানে একলাটি বসে আছেন! নুটু-দা' থিয়েটার দেখ্‌তে গেল, আপনাকে নিয়ে যায় নি ?"

ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে জ্যোতিষ বলিল, কোন একটা থিয়েটারে কি একটা পৌরানিক নাটকের আজ প্রথম অভিনয় রজনী ; সে দেখিয়া আসিল নটবর থিয়েটারের টিকিট করিয়া বাহির হইতেছে।

সুষমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বলিল—"সে কি! তিনি যে সোমেশ্বর বাবুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেলেন !"

"সোমেশ্বর বাবু ? কে তিনি ?"

"ও সব খবর তুমি বুঝি কিছু রাখ না ? কলকাতার সেরা গাহিয়ে সোমেশ্বর ভাদুড়ি, ক'দিন হ'ল মারা গেছেন—আজ তাঁ'র শ্রাদ্ধের ভোজ।"

জ্যোতিষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"ও সব কথা আপনি বিশ্বাস করেন নাকি ? ও সব ডাহা মিথ্যে কথা—একলা একলা থিয়েটার দেখ্‌বার জন্যে ঐ রকম বানিয়ে বানিয়ে বলেচে। গাহিয়ে-বাজিয়ের খবর আমি আবার রাখি না! কিন্তু ঐ যে কি নামটা বল্‌লেন, তা ত' কস্মিন কালেও শুনিনি।"

সুষমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

কিন্তু হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় আসিতেই সে বলিল—"আচ্ছা, এখন গেলে কি টিকিট পাওয়া যায় না?—আমরা যদি যাই?"

"তা' বল্‌তে পারি না—পাওয়া যেতেও পারে। সত্যি যা'বেন নাকি? তা' হ'লে কিন্তু দেরী কর্‌লে চল্‌বে না, চট্‌পট্‌ তয়ের হয়ে নিন্‌—আমি ছুটে গিয়ে গাড়ী ডেকে আনি।"

পনেরো মিনিটের মধ্যে জ্যোতিষ তাহার মাসিমা এবং বৌ-দিদিকে থিয়েটারে পৌছাইয়া দিল। সুষমা বলিয়া দিল—"আমরা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌বো না, ভাঙ্‌বার আগেই বাড়ী পৌছে দিও।"

৮

নটবর আসিয়া দেখিল সুষমা শুইয়া পড়িয়াছে। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে মৃদুস্বরে বলিল—"ঘুমলে নাকি? তা ঘুমও—রাত অনেক হয়েচে। আর কাজের বাড়ী থেকে ত এর আগে আসা যায় না।"

সুষমা একটু নড়িয়া চড়িয়া পিছন ফিরিয়া শুইল। নটবর বুঝিল সে ঘুমায় নাই। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কাজ-কর্ম্ম সব মিটে গেল—সোমেশ্বর ভাদুড়ির সব শেষ!"

এইরূপ শত শত মিথ্যা কথা সুষমা এতদিন নির্ব্বিচারে পরিপাক করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ আর সহ্য হইল না। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া শয্যার এক প্রান্তে গিয়া বসিল—তাহার চক্ষে বিদ্রোহের অগ্নি-শিখা!—দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আর বল্‌তে হ'বে না তোমার

সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথা ! আমি সব জেনেছি, সব দেখেছি। আমিও সোমেশ্বর ভাদুড়ির শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম—এই দেখ, তোমার মতন প্রীতি-উপহারও নিয়ে এসেচি !" বালিশের তলা হইতে থিয়েটারের প্রোগ্রামটা বাহির করিয়া নটবরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

নটবরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বলিল—"বটে? থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়া হয়েছিল! কা'র সঙ্গে শুনি?"

"জ্যোতি-ঠাকুরপোর সঙ্গে গিয়েছিলুম—আমি আর পিসিমা। শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে কি রকম খাটছিলে তুমি, সব দেখে এসেছি!"

নটবরের বুদ্ধিলোপ হইল। কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল—"জ্যোতে ছোঁড়াটা ভারি বদ্ হয়েছে।"

"হ্যাঁ, জ্যোতে ছোঁড়াটা বদ্ বই কি! আর যে এতকাল ধ'রে দিনের পর দিন নিজের স্ত্রীকে রাশি রাশি মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়ে এল, সে বড় সৎ, নয়?"

হায়! সোমেশ্বর ভাদুড়ি শেষে মরিয়া এত বড় শত্রুতা করিল! নটবর দেখিল আর হালে পানি পায় না। বুঝিল মিথ্যার জয় চিরকাল হয় না। তাসের প্রাসাদ যত যত্নেই গড়িয়া তোলা যাক্ না কেন, এক ফুৎকারেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়।

সে এবার সুর বদ্‌লাইল। নানা ভাবে, নানা ছন্দে, সুষমার প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য কত চাটুবাক্যই বলিল। কিন্তু সুষমার দুর্জ্জয় অভিমান কিছুতেই ভাঙ্গিল না—সে অত্যধিক গম্ভীর মুখে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

নটবর ক্রমে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইল। ব্যথিত অপ্রসন্ন স্বরে সে বলিল—"হাজার দোষ হ'লেও, স্বামী ত! স্বামী বলেও কি একটু শ্রদ্ধা কর না সুষমা? তবে কি তুমি আমায় ঘৃণা কর?"

সুষমা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল—বেশ ছিল। এইবার সে ঝোঁকের মাথায় বলিয়া বসিল—"হ্যাঁ করি!" বলিয়াই কিন্তু সে শিহরিয়া উঠিল;—এত বড় মিথ্যা কথাটা সে কেমন করিয়া মুখে আনিল? নটবরের সহস্র মিথ্যা যে ইহার তুলনায় কিছুই নয়!—ছিছি! কি লজ্জা!

টপ্ করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া সে তাহার এই বিরাট লজ্জাটাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

অন্ধকারে নটবরেরও যেন একটু স্বস্তি বোধ হইল। সামনা-সামনি যে কথা বলিতে তাহার দ্বিধা হইতেছিল, এই যবনিকার অন্তরালে তাহা অনেকটা সহজ হইয়া গেল। আবেগ-কম্পিত কাতর কণ্ঠে সে বলিল—"সুষমা, সত্যিই আমার বড় অপরাধ হয়েছে—কিন্তু তুমি কি ক্ষমা করবে না সুষমা?"

নটবর সুষমার কণ্ঠে এ প্রশ্নের কোন উত্তর শুনিল না। উত্তর কিন্তু পাইল সে—

সুষমা লজ্জায় সে কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া বোধ করি কানে-কানে বলিতে গিয়াছিল, অন্ধকারে তাহার ঠোঁট দু'খানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কানেরই এক পার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া প্রগাঢ় ক্ষমার চিহ্ন আঁকিয়া দিল!

"বিচিত্রা"—ফাল্গুন, ১৩৩৯

প্রতীক্ষা

১

সকল দেবতারই যেমন এক-একটা প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা আছে, নিদ্রাদেবীরও তা'ই। কারুর আবাহন-আরাধনায় সহজে তাঁ'র আসন টলে না। কিন্তু পাথাটানা কুলি কিংবা চৌকীদারের চক্ষে এসে ভর কর্‌বার জন্যে তিনি সর্ব্বদাই ঘুর্ ঘুর্ ক'রে বেড়ান! তাই গৌরীকে আজ তিনি কিছুতেই ধরা দিলেন না।

দুপুর-বেলা রোজকার মতন মায়ের সঙ্গেই খেতে বসেছিল সে। কিন্তু কি ক'রে যে আজ তার এত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হ'ল, তা' সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে, দু'-চার্‌টে খুচরো কাজ সেরে যখন সে ঘরে ঢুক্‌ল, মা তখনও রান্নাঘরে বসে ডাঁটা চিবচ্ছেন। মায়ের এই নিশ্চেষ্ট তন্ময় ভাব দে'খে মেয়ে একটু-খানি হেসে দরজা ভেজিয়ে দিলে।

ঘরে তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা ছিল। কাছে গিয়ে গৌরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি খানিকটা ভাব্‌লে, তা'রপর বিছানার উপর ব'সে একটু এদিক-ওদিক চেয়ে, ভিজা চুলগুলি জানালার সামনে ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়্‌ল।

তার পরেই চোখ দু'টি বুজে ঘুমিয়ে পড়্‌বার জন্যে নানা রকম সাধনা হ'তে লাগ্‌ল। কখনও এ-পাশ ফিরে, কখনও ও-পাশ ফিরে, যত রকম শোবার ভঙ্গী হ'তে পারে একে একে পরীক্ষা ক'রে ঘুম আসার পক্ষে কোনোটাই অনুকূল ব'লে মনে হ'ল না। চোখ না চেয়েই হাত বাড়িয়ে পাখাখানা তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে একটু বাতাস আরম্ভ কর্‌লে। আঃ! মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, এইবার নিশ্চয় ঘুম আস্‌ছে। যেন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়্‌ছি—এই মনে ক'রে গৌরী তা'র হাতখানা আল্‌গা ক'রে দিলে, হাত যেন ঘুমের ঘোরে নাড়া আর যায় না, পাখাখানা প'ড়ে যায় আর কি! বারবার এ রকম ক'রেও সত্যিকার ঘুম কিন্তু এল না। বরং পাখাখানা মেজের উপর প'ড়ে যেন একটা কর্কশ বিদ্রূপ ক'রে উঠ্‌ল,—গৌরীর কল্পিত ঘুমের ঘোর ভেঙে গেল।

নিদ্রাদেবীর এই অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় গৌরী তা'র চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতায় কখনও পায়নি, আজ ভাল করেই জান্‌লে।

দিনের বেলা গৌরী প্রায় ঘুমায় না, কিন্তু মায়ের একটু গড়ানো অভ্যাস আছে। তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন দরজা ভেজানো রয়েছে। নিঃশব্দে একটা কপাট একটুখানি খুলে উঁকি মেরে দেখ্‌লেন, মেয়ে তাঁ'র প্রাণপণে চোখ দু'টি বুজে চুপ ক'রে শুয়ে আছে।

আবার নিঃশব্দে দরজা টেনে দিয়ে গৌরীর মা দাওয়ার এক পাশে এসে দাঁড়া'লেন। তাঁ'র চোখে-মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল, মনে পড়্‌ল—আজ জামাই আস্‌বে। সেই সঙ্গে আরও মনে পড়ে গেল ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তিনিও এই গৌরীর মতনটি।

পাড়া-বেড়ানো, আম-কুড়ানো, কাঁথা-শেলাই, কড়িখেলা, সব ভুলে গিয়ে তিনিও কতদিন এমনি ক'রে আশা-কম্পিত হৃদয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করেছেন। ভাব্‌লেন—এও যে ঠিক তেমনিই!

আজ আর তাঁর গড়ানো হ'ল না। কতদিন পরে আজ জামাই আস্‌ছে, তা'র জন্যে যা-হ'ক কিছু ভাল-মন্দ খাবারের আয়োজন কর্‌তে হ'বে ত। বাছা কোন্ বিদেশে বাসায় প'ড়ে থাকে,—খাওয়া-দাওয়ার কত কষ্ট!

গোটা-দুই নার্‌কেল ভেঙে কুরে রেখে, গৌরীর মা পাড়ায় একটু ঘুর্‌তে বেরুলেন।

২

গৌরীর মা আজ কেবল গৌরীরই মা। কিন্তু সে বেশী দিনের কথা নয়, যখন তিনি পুত্রকন্যা-পরিবেষ্টিতা স্বামী সোহাগিণী হয়ে ভাগ্যবতী নারী-হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা দেবতার চরণে নিবেদন ক'রে গভীর তৃপ্তিলাভ করিতেন। তা'রপর এই ক'-বছরের মধ্যে একে একে তাঁ'র স্নেহের পুত্তলিগুলিকে হারিয়ে, শেষ বজ্রপাতে যখন তিনি নিরাশ্রয় লতার মতন লুটিয়ে পড়্‌লেন, তখন দশ বছরের মেয়ে গৌরীই তাঁ'র জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল।

জমি-জমা যেটুকু ছিল তা' থেকে দু'টি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন হয়েও কিছু কিছু বাঁচ্‌ত। গৌরীর মায়ের হাতে সেটা জম্‌তে লাগল। হিন্দুর

ঘরের বিধবার পক্ষে জীবনধারণেরই কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না,—টাকা জমানোর ত কথাই নাই! কিন্তু গৌরীর মায়ের বেলায় দু'টারই প্রয়োজন ছিল। গৌরীকে সৎপাত্রে দান করা—এই শেষ কর্ত্তব্যটুকু সারতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্তমনে ইহ-সংসার থেকে ছুটি নিয়ে পরপারের সেই সাজানো সংসারে গিয়ে প্রাণ জুড়া'বেন।

প্রতিবেশীদের সাহায্যে গৌরীর মায়ের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। হরলাল বেশ মনের মতন জামাই হয়েছে। বর-কনের কোষ্ঠী মিলিয়েই নাকি রাজ-যোটক নির্ণয় হয়ে থাকে। দু'জনের দুরদৃষ্টের মিল হ'লেও যদি কোন রকম যোটক হয়, তা'হ'লে এ ক্ষেত্রেও হয়েছে। কারণ হরলালও গৌরীর মতন হতভাগ্য—বরং বেশী। সে অল্প বয়সে বাপ-মা-হারা হয়ে মামার আশ্রয়ে থেকে মানুষ হয়েছে।

কিন্তু তা'র জন্যে মামাদের বিশেষ কোনও চেষ্টা বা অর্থব্যয় করতে হয়নি। মামাতো ভাইদের পাতের ভাত খেয়ে যেমন তা'দেরই মতন হরলালের দেহের পুষ্টি হয়েছে, তেমনি লেখাপড়া শেখার বেলাও, হরলাল ভাইদের ছেঁড়া বই-খাতা সংগ্রহ ক'রে, তা'দের পড়া শুনে, লুকিয়ে হাত-মক্স ক'রে, ঠিক তা'দেরই সমান লেখাপড়া শিখেছে—সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়।

হরলালের মামাতো ভাইরা তাস-পাশালির আড্ডায় তা'দের অর্জ্জিত বিদ্যার কি রকম সদ্ব্যবহার করে জানিনা, কিন্তু হরলাল এই বিদ্যার জোরেই সহরে গিয়ে ছাপাখানায় একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে।

হরলালের বিদ্যার পরিমাণ ঐ পর্য্যন্ত,—উপার্জ্জনের পরিমাণ মাসিক সাতাশ টাকা, তা'ছাড়া কিছু কিছু উপরি খাটার দরুণ আরও দু'-পাঁচ টাকা।

তবু গৌরী তা'কে পেয়ে জীবন সার্থক জ্ঞান করে। যা'র জন্যে কতদিন ভোরে উঠে ফুল তুলে শিবপূজা করেছে—এ যেন ঠিক সেই। কারণ নারী-হৃদয়ের অনুরাগ পা'বার জন্যে বিদ্যা কিংবা অর্থের চাইতে যা' বেশী দরকার, হরলালের তা' ছিল—রূপ আর গুণ। তা'র রূপের প্রশংসা ক'রে প্রতিবেশিনীরা বলেছেন যে, ঠিক 'হর-গৌরীর' মিলনই হয়েছে বটে !

এতদিনে গৌরীর মায়ের জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে। তবু তিনি আয়ুর মেয়াদ আর একটু বাড়া'তে চান,—গৌরীর কোলে একটি খোকা দেখ্‌লেই তাঁ'র সব সাধ পূর্ণ হয়। তখন তিনি অনায়াসে সংসারের মায়া কাটিয়ে যেতে পার্‌বেন।

৩

নানা রকম কসরৎ ক'রেও যখন কিছুতেই গৌরীর ঘুম এল না, তখন সে বিরক্ত হয়ে উঠে বস্‌ল। চুলে হাত দিয়ে দেখ্‌লে প্রায় শুখিয়ে এসেছে। সারা পিঠের উপর সেই একরাশ চুল বেশ ক'রে ছড়িয়ে দিতে দিতে সে খানিকক্ষণ ব'সে কি ভাব্‌ল। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে মাকে খুঁজতে লাগ্‌ল। ডেকে সাড়া না পেয়ে সে বুঝ্‌ল, খিড়কী দরজায় বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে তিনি কোথাও গিয়েছেন।

চোখ মুখ ধুয়ে, একটা পান সেজে মুখে দিয়ে গৌরী উঠানের দড়ি থেকে কাপড় তুলে এনে কুঁচিয়ে রেখে দিলে। দেয়ালে একটা আয়না ঝুলানো

ছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে রাঙা ঠোঁট দু'খানির দিকে চেয়ে সে ফিক্ করে হেসে ফেল্‌লে। তা'র পরেই নজর পড়্‌ল মাথায়। যাত্রার দলের মা-যশোদার মতন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলা দেখে আবার একচোট হাসি!

পাশেই কুলঙ্গিতে চুল-বাঁধার সরঞ্জাম থাকে। সেখান থেকে চিরুনিখানা নিয়ে, একবার এ-দিক ও-দিক চেয়ে সিঁথি কাটতে লেগে গেল। কিন্তু কিছুতেই আর ঠিক মতন কাটা হয়না,—হয় বাঁকা-চোরা, নয় একপেশে হয়ে যায়। চুল আঁচ্‌ড়ানো, খোঁপা বাঁধা, টিপ পরা, এ সব ত রোজই আছে, কিন্তু এমন ত কোনদিন হয় না! আজ কেবলই মনে হয়, সে যেন চুরি করতে এসেছে; ভয় হয়, কে কখন কোথা থেকে দেখে ফেল্‌বে—হাত কাঁপ্‌তে থাকে। কোথায় খুট্ ক'রে শব্দ হয়, অমনি সে তাড়াতাড়ি চিরুনিখানা কুলঙ্গিতে ছুঁড়ে ফেলে ধপ্ ক'রে তক্তপোষের উপর ব'সে পড়ে। আবার একটু পরে পা টিপে টিপে গিয়ে চিরুনি হাতে ক'রে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

এই রকম ক'রে কতক্ষণ গেল। এমন সময়ে বাইরে কা'দের গলার সাড়া পেয়ে সে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পথের ধারে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। তখন পাঠশালার ছুটি হয়েছে। পড়ুয়ার দল বাড়ী ফিরছে, মুক্তির আনন্দে গ্রাম্যপথখানি মুখরিত ক'রে। গৌরী সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"গোপাল, অ গোপাল, একবার আমাদের বাড়ী আস্‌বি না ভাই?"—জানালা থেকে গৌরী বল্‌লে।

গোপাল চোখ তুলে দেখ্‌লে; বল্‌লে—"গৌরী-দি'? আস্‌ছি ভাই, একবার বাড়ী হয়ে আসি।"

গৌরী বড় ব্যাকুল স্বরে বল্‌লে—"আগে শুনে যা না, একটা দরকার আছে। এইখানেই জলপান ক'রে বাড়ী যাস্ 'খন। ক'-দিন ধ'রে তোর জন্যে একটা জিনিষ রেখেছি, আসিস্‌নি ব'লে দেওয়া হয়নি। আয় একবার, লক্ষ্মীটি !"

গোপাল পাড়ার ছেলে। গৌরী তা'কে ছোট ভাইটির মতন ভালবাসে। গোপালও গৌরীর একান্ত অনুগত।

পুকুর-ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে গোপাল দাওয়ায় এসে বস্‌তেই গৌরী তা'কে একসরা গুড়-মুড়ি এনে দিলে। এক খোরা নারকেল-কোরা ঢাকা দেওয়া রয়েছে দেখে, তা'র বুঝ্‌তে দেরি হল না যে কিসের জন্যে রয়েছে। তবু তা' থেকে একমুঠো তুলে গোপালকে না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না।

গোপালকে খেতে দিয়ে গৌরী তার তোরঙ্গ খুলে, কাপড়-চোপড় ওলট-পালট ক'রে কি বার ক'রে নিয়ে এল। হাতের মুঠোটা গোপালের সুমুখে ধ'রে বল্‌লে—"এতে কি আছে বল্ দেখি? বল্‌'ত পারিস্ ত পাবি।" গোপাল আন্দাজ ক'রে নানা রকম জিনিষের নাম করে। কিন্তু গৌরী হাসে, কেবলই বলে,—হ'ল না। এই অপরূপ জিনিষটা যে কি, তা' নির্ণয় কর্‌তে না পেরে গোপালকে শেষে হার মান্‌তে হ'ল। গৌরী তখন হাতের মুঠো খুলে দেখালে—একজোড়া মার্ব্বেল !

গোপাল চম্‌কে উঠ্‌ল। "ও, মার্ব্বেল ! বাঃ বেশ সুন্দর ত !" তার পর ব্যকুল আগ্রহে তা'র বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—"একবার দেখ্‌তে দেবে না, দিদি ?"

গৌরী হেসে বল্‌লে—"কোথাকার বোকা ছেলে রে ! তোর জন্যেই ত আনিয়ে রেখেছি। আমি এ নিয়ে আর কি করব।"

মার্ব্বেল হাতে পেয়ে গোপালের খাওয়া ঘুরে গেল। বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—"এ কোথায় পেলে দিদি ?"

"সেদিন বুড়ীর মা হাটে গিয়েছিল, সেই এনে দিয়েছে।"

"কত দাম, দিদি ?"

"সে খোঁজে তোর কি দরকার বল্‌ দেখি! নে, চট্‌পট্‌ খেয়ে নে।"

গোপাল থাবা থাবা করে মুড়িগুলা শেষ করলে। গৌরী তখন একখানা চিঠি তা'র হাতে দিয়ে বল্‌লে—"গোপাল ভাই, চিঠিখানা এইবার ভাল ক'রে পড়্‌ দেখি শুনি।"

গোপালের তখন মন প'ড়ে রয়েছে মার্ব্বেলের উপর। তবু যথাসম্ভব আত্ম-সংযম ক'রে সে অতি সন্তর্পনে চিঠির ভাঁজ খুলে ধীরে ধীরে পড়্‌তে আরম্ভ করলে। দু'-তিন ছত্র প'ড়েই গোপাল বল্‌লে—"ও দিদি, এ যে কতদিনের পুরনো চিঠি! এ আর কতবার প'ড়ে শোনা'ব ?—প'ড়ে প'ড়ে ত প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে।"

গৌরী একটু ম্লান হেসে বল্‌লে—"মুখস্থ কি আমারই হয়নি ভাই ? তবু সব কথা ত ঠিক মনে নেই—আর একবার পড়্‌না শুনি।"

গোপাল তার আল্‌গা মুঠোর ভিতরে মার্ব্বেল দু'টাকে নেড়ে বাজা'তে বাজা'তে হেসে বল্‌লে—"তার চাইতে একটু লেখাপড়া শিখে নিলে ত হয়। নিজেই তা' হ'লে চিঠি পড়্‌তেও পার, লিখ্‌তেও পার। কিন্তু এত ক'রেও ত শেখাতে পার্‌লাম না।"

লজ্জায় গৌরীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। গোপাল আর বেশী কিছু না ব'লে চিঠিখানা প'ড়ে শোনালে।

চিঠিখানা হরলালের, গৌরীকে লিখেছে। সে হ'ল আজ দু' হপ্তার কথা। তা'র মধ্যে খুব কম হ'বে ত বার দশেক গৌরী গোপালকে দিয়ে পড়িয়ে শুনেছে। হরলাল অনেক কথা লিখেছে, কিন্তু তার অধিকাংশ গোপাল নিজেই প'ড়ে বুঝ্‌তে পারে না। গৌরী বরং আন্দাজে কতকটা বুঝেছে। সারাংশ সংক্ষেপে এই যে হরলাল গৌরীর কাছে আস্‌বার জন্যে নিতান্ত ব্যগ্র থাকা সত্ত্বেও ছুটির অভাবে আস্‌তে পারে না। কিন্তু এবার সে উনিশে বোশেখ শনিবার দিন আস্‌বে ঠিক করেছে। যদি সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা পাওয়া যায়, সন্ধ্যার পরেই পৌঁছা'বে,—না হ'লে দেরি হ'তে পারে।

গৌরী বল্‌লে—"হ্যাঁ গোপাল, আজ ত শনিবার, উনিশে বোশেখ আজই নয় ?"

গোপাল মনে মনে কি হিসাব ক'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—"ও দিদি, তাই ত বটে ! দাদাবাবু তা' হ'লে আজই আস্‌বে ?"

গৌরীর মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে উঠ্‌ল, চোখ দু'টি জল্‌জল্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

এই সময়ে মাকে খিড়কী দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুক্‌তে দেখে গৌরী টপ ক'রে গোপালের হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে হাতের মুঠার মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে। এই অতর্কিত ঘটনায় গোপাল যে রকম সচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, মনে হ'বে যেন দু'জনে মিলে চুরি কর্‌তে এসে সে একাই ধরা প'ড়ে গিয়েছে।

গৌরীর মা জেলেবাড়ী থেকে মাছ, আর প্রতিবেশীদের বাগানের পাঁচ রকম তরি-তরকারি সংগ্রহ ক'রে এনে রান্নাঘরের দাওয়ায় সেগুলা ফেলে, মেয়েকে একটু তাড়না ক'রে বল্‌লেন—"এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে

ব'সে গল্প হচ্ছে ? বেলা যে গেল, চুল-টুল বাঁধ্‌তে হ'বে না ? নে, চট্‌ ক'রে দড়ি-চিরুনি নিয়ে আয়। আমার এখনও সব কাজ প'ড়ে।"

গোপাল আস্তে আস্তে স'রে পড়্‌ল।

গৌরী যত বাজে কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল; বল্‌লে—"সে হ'বে 'খন, তুমি নিজের কাজ কর না বাপু!"

আসল কথা, গৌরী মায়ের কাছে চুল বাঁধ্‌তে রাজী নয়। তাঁ'র সেই সেকেলে ধরণের 'পেটো পেড়ে' চুল বাঁধা,—অন্য দিন হ'লে চল্‌ত, কিন্তু আজ চলে না। আজ সে নিজে পছন্দ-মত ক'রে বাঁধ্‌বে।"

"জানি না বাপু, যা' খুসি কর্‌"—ব'লে গৌরীর মা রান্নার যোগাড়ে লাগ্‌লেন।

গৌরী ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধ্‌লে। তার পর যখন সে পুকুর-ঘাটে গা' ধু'তে গেল, মা কুটনো কুটতে কুটতে বল্‌লেন—"আজ সেই খেজুর-ছড়ি ডুরেখানা বা'র ক'রে পরিস্‌, জান্‌লি ?"

ঝঙ্কার দিয়ে গৌরী বল্‌লে—"হ্যাঁ, খেজুর-ছড়ি না আরও কিছু,—ভারি ত!"

মা রাগ ক'রে বল্‌লেন—"তবে কি ময়লা চিরকুট প'রেই থাক্‌বি না কি ?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে গৌরী জবাব দিলে—"সে যা' হয় একখানা পরব 'খন। ঐ জাম-রঙের শাড়ীটাই না হয়—"

মেয়ের অলক্ষিতে মুখ টিপে একটু হেসে গৌরীর মা নিজের কাজে মন দিলেন।

৪

সন্ধ্যার সময় কাল-বৈশাখার ঝড় উঠ্‌ল। পথের ধূলায় আকাশ ভ'রে গেল, গাছপালাগুলা এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে। প্রকৃতির এই রুদ্র মূর্ত্তি দে'খে গৌরীর বুক দুর্ দুর্ কর্‌তে লাগ্‌ল। শোবার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে সে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে বস্‌ল। রান্নাঘরের চাল খ'সে খ'সে ভিতরে পড়্‌ছিল; কাজেই গৌরীর মা খা'বার জিনিষপত্রগুলা ঢেকে রেখে কাজ কামাই দিয়ে ব'সে রইলেন।

হরলালের এতক্ষণে ও-পারে এসে পৌঁছবার কথা। কিন্তু এ সময়ে নদী পার হওয়াও বিপজ্জনক। এই দুর্য্যোগে সে কোথায় কি কর্‌ছে তাই ভেবে মায়ের মন উদ্বেগে ভ'রে উঠ্‌ল। গৌরীও ম্লান মুখে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে ব'সে রয়েছে দে'খে মা তাঁ'র উদ্বেগ গোপন ক'রে বল্‌লেন—"এ ঝড় আর বেশীক্ষণ নয়, এখনই থেমে যা'বে। আর ঝড় না থাম্‌লে ত কেউ নৌকা ছাড়্‌বে না।"

কথাগুলা কিন্তু নিতান্ত ব্যর্থ হ'ল। উৎকণ্ঠা কারুরই গেল না। দু'জনেই নীরব। উভয়ের মনে একই চিন্তা, কিন্তু কেউ কারুকে মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারে না।

ঝড়-বৃষ্টি যখন ক্রমশঃ প্রায় থেমে এল, তখন বেশ রাত হয়েছে। হরলাল তখনও এসে পৌঁছল না। গৌরীকে তা'র মা খেয়ে নিতে বল্‌লেন; হরলাল হয়ত আজ আর এল না।

গৌরী মায়ের কথা শুনে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। মা বলে কি!

সে আস্‌বে না? অত ক'রে লিখেছে সে নিশ্চয়ই আস্‌বে,—গোপাল খুব কম হ'বে ত বিশ বার প'ড়ে শুনিয়েছে। কিন্তু মা সে কথা জান্‌বেন কি ক'রে, আর তাঁ'কে বোঝানোই বা যায় কি ক'রে?

সে কিছুতেই খেতে রাজী হল না; বল্‌লে—"আর একটু হোক্ না, আগে-ভাগে খেয়ে ব'সে থাক্‌ব? আমি কি এখনও ছেলেমানুষটি আছি?"

মা ভাব্‌লেন—তাও ত বটে। গৌরী তাঁ'র কাছে সন্তান হ'লেও সে যে আজ শৈশবের সীমা ছাড়িয়ে এক ধাপ উঁচুতে উঠে পড়েছে। আর একজনের জন্যে নিজের সুখ-স্বার্থ ভুলে যাওয়ার যে এত বড় অধিকার সে পেয়েছে তা' সে ছাড়্‌বে কেন? একটা অব্যক্ত গর্ব্বে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। আনন্দাশ্রুতে চোখ দুটি ঈষৎ সিক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বুজে এল।

গৌরী বল্‌লে—"মা, তোমার ঘুম পাচ্ছে, তুমি একটু জল খেয়ে বরং শুয়ে পড়,—কাল ত আবার একাদশী।" তা'র গলার স্বরে একটা বেদনার সুর বেজে উঠ্‌ল।

মা দেখ্‌লেন গৌরী আজ হঠাৎ এত বড় হয়ে পড়েছে যে, তাঁ'কেই সে সন্তানের স্থানে বসিয়ে স্নেহের শাসনে নিজের ইচ্ছামত চালা'তে চায়।

অসহায় শিশুর পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে তাঁ'র দীর্ঘ-ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ জীর্ণ বক্ষটি গৌরীর কোলে লুটিয়ে দিয়ে মা এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব কর্‌লেন।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত প'ড়ে থেকে গৌরীর মা উঠে রান্নাঘরে গেলেন। সেখান থেকে দুজনে মিলে খাবার বয়ে এনে শোবার ঘরে তক্তপোষের তলায় ঢাকা দিয়ে রেখে, নিজে একটু কিছু খেয়ে, ভাঁড়ার ঘরে শুতে গেলেন। যা'বার সময় গৌরীকে ব'লে গেলেন দরকার হ'লে যেন তাঁ'কে ডাকে।

৫

বৃষ্টি ধ'রে গিয়ে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু হাওয়া তখনও বেশ জোরেই বইছে। দশমীর ভাঙা চাঁদ তখন পশ্চিমে ঢলেছে, তা'র আলোয় পৃথিবী আবার হাস্‌ছে,—জননীকে দেখে শিশুর অশ্রুসিক্ত বদনে যেন হাসি ছড়িয়ে পড়িছে। মাঝে মাঝে এক একটা খণ্ডমেঘ উড়ে এসে চাঁদকে ঢাকা দেবার বিফল চেষ্টা ক'রে স'রে পড়্‌ছে।

গৌরী রোয়াকের খুঁটি ঠেস দিয়ে ব'সে কুচো মেঘগুলার ছুটাছুটি দেখ্‌ছিল। তা'র মনে হল, জগতের পুরুষগুলাও ঠিক এই রকম। তা'রাও এমনি ক'রে নিজের মনে নানা কাজে, কিংবা বিনা কাজে, অবাধে ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়, কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। যা'রা তা'দের প্রতীক্ষায় নিশিদিন ধ'রে পথ চেয়ে ব'সে থাকে, তা'দের প্রাণের উপর ক্ষণেকের জন্য একটা ছায়া ফেলে দিয়ে নিজের গন্তব্য পথে চলে যায়—ধরা দিতে চায় না।

এই ত হরলাল সেই কবে এসেছিল—দুদিনের তরে! তারপর এতকাল দিব্যি ভুলে আছে। আর গৌরী বেচারী এখানে প'ড়ে—

কিন্তু না, সে ত তেমন নয়। তা'র কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণ, আদর-সোহাগের ভিতর দিয়ে গভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় ত। সে যতটুকু সময় কাছে থাকে, তা'র মধ্যে তা'র ভালবাসায় সন্দেহ করবার অবকাশ পাওয়া যায় না। তারপর, তা'র চিঠিপত্র? চিঠি সে বেশী লেখে না বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে ক'-খানা লিখেছে, তা'তে যে প্রাণের কতখানি আবেগ সে ঢেলে দিয়েছে—গোপালের পড়্‌বার ভঙ্গীর দোষ সত্ত্বেও—তা' বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।

হরলাল একবার লিখেছিল,—মাঝে মাঝে মনে হয় যদি পাখী হ'তাম, ইচ্ছামতন উড়ে গিয়ে তোমায় দেখে আস্‌তাম ; কিংবা ছাপাখানার ফটকের পাশে যে নিমগাছটা আছে, তা'র ডালে বাসা বেঁধে তোমাকে নিয়ে বেশ থাকৃতাম।

গৌরী উঠে গিয়ে তোরঙ্গ খুলে একখানা হলুদ-ছোপানো নেকৃড়ায় বাঁধা একতাড়া চিঠি বা'র ক'রে বিছানার উপর সাজা'তে লাগ্‌ল। এগুলি সব হরলালের লেখা চিঠি—খান দশ-বারোর বেশী হ'বে না। গৌরী লেখাপড়া জানে না, কোন্ চিঠিখানা কবে এসেছে বলতে পারে না; কিন্তু কোন্‌খানার পর কোন্‌খানা, আর কিসে কি লেখা আছে—মনে ক'রে মোটামুটি বল্‌তে পারে। সে খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিগুলা পর পর সাজিয়ে একখানা একখানা ক'রে খুলে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তা'কে তখন দেখ্‌লে মনে হ'বে কত মন দিয়েই না পড়ছে! কিন্তু পড়্‌বে আর কি? চিঠি খুলে সেদিকে চাইলেই সব কথা তা'র মনে পড়ে যায়,—মনে মনে তা'রই পুনরাবৃত্তি ক'রে একটু হেসে আবার মুড়ে রেখে দেয়।

এই রকম ক'রে সব চিঠিগুলাই 'পড়া' হয়ে গেল। তার পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। এই যে চিঠি-গুলাতে এত ভালবাসার কথা লিখেছে, এ সবই কি মিথ্যা—শুধু তা'কে ভোলা'বার জন্যে লেখা? তা' যদি নয়, তবে আজ সে এল না কেন? ঝড়-বৃষ্টির জন্যে? কিন্তু এই রকম ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে যদি সে আস্‌তে না পারে, তবে আর ভালবাসা কি?

হঠাৎ সদর-দরজায় শিকল নাড়ার শব্দ হ'ল। গৌরী তাড়াতাড়ি চিঠি-গুলা জড়ো ক'রে বালিশের তলায় চেপে রেখে, উঠি-কি-পড়ি ক'রে ছুটল।

ঘর থেকে উঠানে নেমেই দেখ্‌লে আবার আকাশে মেঘ জমেছে, ঝড় উঠেছে, তড়্‌বড়্‌ ক'রে বৃষ্টিও এসেছে। সে জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তেই গিয়ে সদর দরজার খিল খুলে দিয়ে দাঁড়া'ল।

কিন্তু কই! দোর ঠেলে কেউ ত এল না, কারুর কোন সাড়া-শব্দ ত নেই! সে তাড়াতাড়ি দরজাটা টেনে খুলে ফেল্‌লে। গলা বাড়িয়ে এ-দিক ও-দিক বার কতক দেখ্‌লে—সত্যই কেউ ত নেই! তবে বোধ হয় দম্‌কা হাওয়ায় শিকলটা আপনিই বেজে উঠেছিল। সে ধীরে ধীরে কপাটে আবার খিল এঁটে দিয়ে, পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে এল—বৃষ্টিরও বেগ বাড়্‌তে লাগ্‌ল।

গৌরী আবার ভাব্‌তে বস্‌ল। এত ঝড়-বৃষ্টি কি আজকের জন্যেই জমা ছিল! এই একবার দরজা খুল্‌তে গিয়ে তা'র কাপড় কতখানি ভিজে গিয়েছে। বাইরের অবস্থা তা' হ'লে না জানি কেমন? হরলাল যদি আজ আসে, এতক্ষণে যদি নদী পার হয়েও থাকে, ত কত দূরে এসে পৌছেচে, আর এই বৃষ্টিতে তা'র কত যে কষ্ট হচ্ছে তা'র কল্পনা করতে গিয়ে গৌরীর বুক কেঁপে উঠ্‌ল। প্রাণের ভিতরে একটা মর্ম্মান্তিক স্বর বেজে উঠ্‌ল—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখে যে পরাণ ফাটে॥"

অস্ফুট কাতর স্বরে গৌরী ব'লে উঠ্‌ল—"হে মা কালী! তা'কে সুমতি দাও,—আজ যেন সে না আসে।"

কিন্তু সে যে লিখেছে আস্‌বে—নিশ্চয় আস্‌বে। সত্যি কি তা'ই লিখেছে? সব চিঠির মতন শেষের চিঠিখানাও গোপালকে দিয়ে বার-বার পড়িয়ে, তা'র প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। সব কথাই তা'র বেশ স্পষ্ট মনে পড়্‌ছে, কিন্তু আসল কথাটা কিছুতেই স্মরণ হচ্ছে না। সে কি লিখেছে নিশ্চয় যা'ব, না খুব সম্ভব যা'ব, না যেতে চেষ্টা কর্‌ব, না গেলেও যেতে পারি? এ সমস্যার সমাধান হ'বার ত উপস্থিত কোনও উপায় নাই!

গৌরী তবু হাল ছাড়্‌ল না। বালিশের তলা থেকে চিঠিগুলা বা'র ক'রে শেষের চিঠিখানা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর মনে পড়্‌ল, সে চিঠি ত এ তাড়ার ভিতর ছিল না,—সে ত এখনও তুলে রাখ্‌বার মতন পুরনো হয়নি। বিছানার নীচে, বাক্সর তলায়, মা-কালীর পটের পিছনে, এই রকম জায়গাতেই এখন তা'র স্থান—যা'তে দরকার হ'লে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। আজই ত বিকালে গোপালকে দিয়ে সেখানা পড়িয়েছে। তার পর কোথায় রাখ্‌ল? খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কুলঙ্গিতে চুল-বাঁধা বাক্সর নীচে থেকে বেরুল।

চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলে ধ'রে সে একমনে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে না কি পরের মনের কথাও জানা যায়। চিঠির লেখা-গুলাও যদি তেমনি ক'রে পড়া যেত তা' হ'লে গৌরীর বড় সুবিধা হ'ত।

আস্‌বার কথা চিঠির শেষের দিকে লেখা ছিল। আন্দাজ ক'রে সে জায়গাটা গৌরী খুঁজে বা'র কর্‌লে। কিন্তু তার পর? অনেক মাথা নেড়ে ভেবে ভেবে, সে আবার উঠে তোরঙ্গ খুলে এক গাদা কাপড়ের তলা থেকে টেনে বা'র কর্‌লে—একখানা ছেঁড়া ময়লা 'বর্ণপরিচয়'!

এখানি গৌরীকে লেখাপড়া শেখা'বার উদ্দেশ্যে হরলালের দেওয়া উপহার। কিন্তু বইখানার তেমন সদ্ব্যবহারও হয়নি, আবার প্রণয়োপহারের উপযুক্ত যত্ন ক'রে তুলে রাখাও হয়নি। মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় গোপালকে শিক্ষাগুরুর পদে বরণ ক'রে সে বইখানা খুলে পড়্‌তে বস্‌ত। কিন্তু কখনও নিজের, কখনও গোপালের ধৈর্য্যের অভাবে পাঠ অসমাপ্ত থেকে যেত। তবু এই রকম অনিয়মিত সাধনার ফলে গৌরীর অক্ষর-পরিচয় অনেকটা হয়েছে। অবশ্য অক্ষরগুলাকে আচম্‌কা দেখ্‌লে সে ঠিক চিন্‌তে পারে না; কিন্তু তাদের নামগুলা মুখস্থ থাকায়, হিসাব ক'রে ক'রে প্রায়ই ধ'রে ফেল্‌তে পারে।

গৌরী আজ তা'র বিদ্যার এই পুঁজি নিয়েই চিঠিখানার পাঠ-নির্ণয়ে লেগে গেল। কিন্তু দেখ্‌লে, চিঠির অক্ষর ছাপার কোনও অক্ষরের সঙ্গেই মেলে না! অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে কারুর সঙ্গে কারুকে মেলা'তে না পেরে গৌরীর কান্না পেয়ে গেল। প্রচণ্ড রোষে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু এ রাগটা তা'র কিসের জন্যে? নিজের মূর্খতার জন্যে?—না গোপালের অধ্যাপনার ত্রুটির জন্যে? গৌরীর রাগটা গিয়ে প'ড়্‌ল তা'র উপর—যে নিজে এত লেখাপড়া শিখেছে যে, ছাপাখানায় কত বড় বড় ভাল ভাল বই স্বহস্তে তৈরি করছে, অথচ নিজের বৌটাকে মূর্খ ক'রে রেখেছে, একটু লেখাপড়া শেখাতে পারে না।

আবার সদর-দরজায় সেই শিকল-নাড়ার শব্দ! গৌরী ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে মুখের উপর রোদ-বৃষ্টির বিচিত্র আলো-ছায়া খেলিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ল। কিন্তু এবারও কেউ কোথাও নাই। গৌরী তখন দরজা ভেজিয়ে

ভাব্‌তে লাগ্‌ল—তাই ত, করি কি? এ রকম ক'রে কতবার জলে ভিজে ভিজে এসে ফিরে যা'ব? তা' না হয় পারি—হাজার বার। কিন্তু সে যদি সত্যি সত্যি আসে আর আমি শুন্‌তে না পাই,—কিংবা শুনেও গ্রাহ্য না করি, তা' হ'লে ত বেচারী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভিজ্‌বে। তা'র চাইতে খিলটা খোলাই থাক্‌। আমি ত আর ঘুমুচ্চি না—এই দিকে চেয়ে ব'সে থাক্‌ব 'খন।

তা'ই হ'ল। কিন্তু তক্তপোষখানা এমন ভাবে পাতা ছিল যে, ব'সে থাক্‌লে সদর-দরজা দেখা যায় না—শু'লে দেখা যায়। গৌরী বালিশের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে মাথাটা হাতের উপর রেখে বিছানার এক পাশে কাত্‌ হয়ে দেখ্‌লে সদর-দরজা ঠিক দেখা যায়। এই ভাবে থাক্‌তে থাক্‌তে তা'র মাথাটা বারে বারে ঢুলে পড়্‌ছিল, কিন্তু তখনই আবার সাম্‌লে নিয়ে বলে—না, ঘুমাইনি ত!

নিদ্রাদেবীর অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় গৌরী আজই দুপুর-বেলা কতকটা পেয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়। এইবার বাকীটুকু জান্‌বার সুযোগ এল। বার-কতক ঢুলেই তা'র মাথাটা যখন বালিশের উপর প'ড়ে আর উঠ্‌ল না, তখন 'ঘুমাই নি' বলে আত্মপ্রতারণা কর্‌বার আর তা'র দরকার হ'ল না—প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিদ্রাদেবীর কুহকে প'ড়ে সে সব ভুলে গেল।

গৌরী কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল তা' সে কি ক'রে বল্‌বে? কারণ গাঢ় ঘুমের মাঝখানেও তা'র এই বিশ্বাসটুকু অটল ছিল যে সে ঘুমায়নি। তা'র মনে হচ্ছিল সে যেন কতক্ষণ ধ'রে তেমনি ক'রে সদর-দরজার পানে চেয়ে থেকে থেকে ক্রমে হতাশ হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ

চমকে উঠ্‌ল, আর সেই সঙ্গে সদর-দরজা খুলে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দেখা দিল—হরলালের সেই সুন্দর ঢল-ঢল মুখখানি। নিষ্ঠুর কৌতুকের হাসি হেসে সে যেন বল্‌লে—"কেমন! আস্‌ব ব'লে এলাম না—কেমন জব্দ!" পর মুহূর্তেই গাঢ় অন্ধকারের কোলে সব ডুবে গেল।

গৌরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। রুদ্ধ শোকের আবেগে তা'র কচি বুকখানি ফুলে ফুলে উঠ্‌ল, ঠোঁট দু'খানি কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। পরক্ষণেই কিসের যেন কোমল স্নিগ্ধ স্পর্শে তা'র কম্পিত অধর শান্ত সংযত হয়ে গেল। যেন তা'র পাণ্ডুর শীতল কর্ণমূলে বসন্ত-বায়ুর মৃদু আঘাত লেগে সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়া'তেই গৌরী বিস্ময়-পুলকিত নয়নে চেয়ে দেখ্‌লে সে হরলালের নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে! হরলাল বল্‌ছে—"নৌকার অভাবে সারারাত পার হ'তে পারিনি, শেষে ভোরের বেলা একটা জেলে-ডিঙ্গি ধ'রে যা' হ'ক ক'রে পেরিয়ে আস্‌ছি। আমি এলাম না মনে ক'রে রাগ করেছিলে গৌরী?"

এ কথার গৌরী কি উত্তর দিবে? জীবনে সে কখনও হরলালের উপর রাগ বা অভিমান করেছে কি না, আজকের এই পরম মুহূর্তে তা' স্মরণ কর্‌তে পার্‌লে না। অতীতের সকল দুঃখ-স্মৃতি এই আকস্মিক সৌভাগ্যের জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে। হরলালের বুকের উপর মাথা রেখে গৌরীর মনে হ'ল তা'র আজীবনের সাধনা এতদিনে সফল হয়েছে, তা'র তপস্যায় প্রসন্ন হ'য়ে তা'র ইষ্টদেবতা বরাভয় বিতরণ কর্‌তে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজের সাফল্য-গৌরবে অভিভূত হয়ে সে ভাব্‌ল, জীবনের এমন চরম সার্থকতা আর কারুর ভাগ্যে কখনও ঘটেনি।

কিন্তু সে জানে না, সৃষ্টির কোন্ এক আদিম যুগে, তা'রই মতন আর একজন গৌরী, রাজার নন্দিনী হয়েও কত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে যেদিন এক কৌপীনধারী ভিখারীর কৃপা-কটাক্ষ লাভ ক'রে জীবন ধন্য জ্ঞান করেছিলেন, সেদিন থেকে যুগে-যুগে কত সাধকের কঠোর সাধনা, কত সাধ্বীর দীর্ঘ নীরব প্রতীক্ষা, এমনি এক-একটা শুভ-মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণ সার্থকতায় গৌরবান্বিত হয়েছে। পম্পা-সরসী-তীরে শবরীর আজীবন-সঞ্চিত অর্ঘ্যভার-সজ্জিত আশ্রম-কুটীর রামচন্দ্রের পদার্পণে গভীর তৃপ্তিতে ভ'রে উঠেছিল ; বৃন্দাবনের মাধবী-কুঞ্জে মাধবের আবির্ভাবে রাধিকার বিরহ-নীরব কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—

'আজু মঝু গেহ গেহ করি মানহু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।'

আর আজ এই নবীন উষার রক্তিম রাগে, প্রভাত-বায়ুর মৃদু শিহরণে, ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, গৌরীর জীবনেও সেই শুভক্ষণের আগমন সূচিত হ'ল,—তা'র ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসান হ'ল!

——:০:——

"প্রবাসী"—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

প্রথম চুম্বন

আমি তা'কে সত্য সত্যই প্রাণের সমান ভালবাস্‌তাম। বোধ হয় এ কথা বলাটাই বাহুল্য,—বিবাহিতা পত্নীকে কে কোথায় না ভালবাসে?

তবে এটাও ঠিক যে, এ সে ধারণের ভালবাসা নয়। দেহের সম্পর্কে যে ভালবাসা, বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে যে ভালবাসা উৎপত্তি, এবং একজনের জীবনের সঙ্গে যা'র অবসান,—এ সে ভালবাসা নয়। মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যে ভালবাসা দিন দিন, তিল তিল ক'রে বেড়ে ওঠে,—এ তা'ই।

কিন্তু সে কথা ব'লেই বা কি হ'বে! যা'র জীবন-মরণ এই একটা কথার উপর নির্ভর কর্‌ছিল, তা'কেই যখন বলা হ'ল না, তখন জগৎ-সুদ্ধ লোককে সে কথা শুনিয়ে আর লাভ কি?

তবু বলি। নিজের পাপ নিজের মুখে প্রচার না ক'রে, কেবল আত্মগ্লানির তুষানলে পুড়ে ছাই হ'লেও সে পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না। তাই আজ সব কথা খুলে বল্‌তে হ'ল। যে ভয়ে নিজের কলঙ্ক এতদিন গোপন ক'রে রেখেছি, তা'ই আজ আমার একমাত্র ভরসা। জগতের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ধিক্কারে আমার প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা পূর্ণ হ'ক!

৬

সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলে হয়েও, প্রধানতঃ নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বেশ উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলাম। ছাত্রজীবনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্র-মহলে আমার বিলক্ষণ খ্যাতি-প্রতি-পত্তি হয়েছিল। যখন এম্-এ পড়ি সেই সময় থেকে আমার এই কাহিনী আরম্ভ।

সমপাঠিদের মধ্যে যা'র সঙ্গে আমার সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা'র নাম সনৎ। হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টারের ছেলে সে, ভবানীপুরে বাড়ী। সনৎ ছেলেটি বেশ,—যেমন সুন্দর চেহারা, স্বভাবটিও তেমনি সুন্দর। বড়লোকের ছেলে ব'লে তা'র মোটেই অহঙ্কার ছিল না, বাবুগিরিরও বাড়াবাড়ি ছিল না। পড়াশুনাতেও মন্দ নয়,—তবে অবশ্য আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বার আশা সে কোনদিন করেনি। বরং আমার সংসর্গে পড়াশুনার একটু উন্নতি হ'তে পারে, এই বিবেচনা ক'রেই বোধ হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা একটু ঘনিয়ে তুলেছিল। তা'র সুযোগও হয়েছিল এই জন্যে যে আমিও ভবানীপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাক্‌তাম; আর দুজনের পড়াশুনাও ছিল এক,—এম্-এ আর ল'।

কিন্তু পরের বাড়ীতে বাস,—যদিও আমার ঘর পৃথক এবং বাইরের দিকে, এমন কি সিঁড়ি পর্য্যন্ত আলাদা,—তবু সর্ব্বদা যেন সঙ্কুচিত হয়ে থাক্‌তে হ'ত। তা'ছাড়া সনৎ বল্‌ত, এই বদ্ধ ঘরের ভিতর ব'সে প্রাণ হাঁপাই-হাঁপাই করে। তাই সনৎদের বাড়ীতেই আড্ডা হ'ল। সেখানে কিছুক্ষণ দু'জনে মিলে পড়াশুনা ক'রে, আর তা'র চেয়ে ঢের বেশীক্ষণ গল্প আর উড়ো-তর্ক ক'রে সময় কাট্‌ত।

সনতের বাড়ীতে যতক্ষণ থাক্‌তাম, তা'র মধ্যে তা'র মা-বাপের দেখা

পাওয়া বড় একটা ঘট্‌ত না। কিন্তু একজনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হ'ত। যে দিন তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল, সে দিনকার কথা এখনও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার জীবনের সেটা যে একটা সন্ধিক্ষণ, সেদিন তা' জান্‌তে পারিনি, পরে বুঝ্‌লাম।

আমাদের পরস্পর পরিচয় ক'রে দেবার জন্যে সনৎ প্রথমে আমার খানিকটা অযথা গুণ-কীর্ত্তন ক'রে, শেষে আমার দিকে ফি'রে বল্‌লে,—"ইনি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী,—নাম শোভনা। বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করেন। উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ,—প্রবেশ-অধিকার পা'বার জন্যে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্চেন্! এইবার সব পরিচয় দেওয়া হ'ল, কেউ কারুর অচেনা রইল না ত?"

আমি বল্‌লাম,—"সম্পূর্ণ পরিচয় কই হ'ল? কনিষ্ঠা বল্‌লে কি বুঝ্‌ব? বয়ঃ-কনিষ্ঠা তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্চি, কিন্তু—"

সনৎ বাধা দিয়ে বল্‌লে,—"তবে বলি। আমার তিনটি বোন, তা'র মধ্যে একজন আমার চেয়ে বড়। এই তিন জনের মধ্যে, দু'জন আবার আমাদের মায়া কাটিয়ে, গোত্র-পরিবর্ত্তন করে ফেলেচেন। বাকি আছেন ইনি। কোনদিন ইনিও মায়া কাটাবেন আর কি!"

আমি বল্‌লাম,—"এ তোমার অন্যায় কথা। তোমরাই মেয়েদের পর ক'রে দেবার জন্যে ব্যস্ত। বাঙালীর ঘরের মেয়ের মা-বাপ, ভাই-বোনকে, ছেড়ে অজানা অচেনা লোকজনের মাঝখানে গিয়ে থাক্‌বার জন্যে মোটেই আগ্রহ হয় না।"

অবিবাহিতা বালিকার সুমুখে তা'র বিবাহের প্রসঙ্গ উঠ্‌লে লজ্জা হ'বারই কথা। শোভনার দিকে চেয়ে দেখি, তা'র মুখখানা লাল হয়ে

উঠেছে, মাথাটা একখানা বইয়েয় পাতার উপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে। তা'কে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে, তা'র পড়াশুনার প্রসঙ্গ তুলে কথাটা চাপা দিয়ে ফেলা গেল।

দেখ্‌লাম মোটের উপর মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। বাংলা না নিয়ে সাহস করে সংস্কৃতই পড়্‌চে দেখে, তা'র খুব প্রশংসা কর্‌লাম। কিন্তু দেখ্‌লাম, গণিতে তা'র মাথা তেমন খেলে না,—বিশেষ করে জ্যামিতিতে।

সেদিন এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সনতের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোভনার কথা আমার মনে ছিল। আর কিছু নয়,—তা'র নামটি আমার বড় ভাল লেগেছে।

আমার মনে হয়, এই অধঃপতিত বাঙালী জাতটা অন্ততঃ একটা বিষয়েও জগতের আর সকল জাতকে হারিয়ে দিয়েছে। মানুষের জন্যে এত রকম নূতন নূতন নাম স্থষ্টি করতে, বোধ হয় আর কোন জাত পারে নি। এক এক দেশের বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গোটা কতক বাঁধাধরা নাম আছে, অতি পুরাকাল থেকে তা'ই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার হয়ে আস্‌ছে। কিন্তু বাংলা-দেশের মা-বাপ ছেলেমেয়ের জন্যে আর কোন সংস্থান করতে পারুন বা নাই পারুন, শব্দসিন্ধু মন্থন করে নূতন দুর্লভ নাম সংগ্রহ ক'রে দিতে খুব পটু! তাই বাংলার মাঠে-হাটে-বাটে কত 'কুমুদিনী-কান্ত', 'রমণী-রঞ্জন', 'প্রভাতেন্দু-শেখরের' দর্শন পাওয়া যায়।

গেজেটে যেবার পরীক্ষার ফল বা'র হয়, এই রকম বিচিত্র, অদ্ভুত, বিদ্‌কুটে, নানা রকম রাশি রাশি নামের একত্র সমাবেশ দে'খে আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। গেজেটের পাতাগুলি উল্টে গেলে মনে হয় যেন এক নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে চলেছি,—চারিদিকে কেবল গাছের পর গাছ,—

ছোট, বড, মাঝারি,— এক-একটি এক-এক রকমের, পরস্পর কোন সাদৃশ্য নাই, সামঞ্জস্য নাই। কেবল যেন উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে, মাঝে মাঝে গুটিকতক ফুল ফুটে আছে,—পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের অর্থপূর্ণ মধুর কোমল নাম।

খুঁজে খুঁজে ভাল ভাল নাম সংগ্রহ করা আমার একটা বাতিক ছিল। যে ক'টা নাম আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, তা'র মধ্যে একটি নাম এই শোভনা। কিন্তু বাস্তবিক এ নামটা যে কত সুন্দব, আগে তা'র ঠিক ধারণা ছিল না। উপযুক্ত আধারে প'ড়ে এই 'শোভনা' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ এবং সৌন্দর্য্য আজ সহসা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

[illegible]-মাত্রেরই একটা রূপ আছে,—যদিও সকলে সব সময়ে তা' ধর্‌তে পারে না। [illegible]ীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির পরিক[illegible]ছে। তেমনি এই শোভনা তা'র নামেরই পূর্ণ, জীবন্ত মূর্ত্তি,—অন্য [illegible] যেন, তা'র পক্ষে নিতান্ত বে-মানান্ হ'ত। যিনি এর জন্যে [illegible] সুশোভন নামটি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর কল্পনা-শক্তি [illegible]জ্ঞানের কথা ভেবে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

তাই ব'লে, তা'কে কিছু নিখুঁত সুন্দরী বল্‌চি না। গল্প বল্‌তে বসেছি বলে যে নায়িকার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা কর্‌তেই হবে, এমন কি কথা আছে? বাস্তবিক, শোভনার যেটুকু দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌লাম, তা' মোটেই অসাধারণ নয়, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়। তা'র চোখে-মুখে, তা'র প্রতি অঙ্গে, যে-একটা কোমল শান্ত শোভা ছেয়েছিল, তা' রাস-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতন স্থির, স্নিগ্ধ, শীতল,—বিদ্যুৎ-বিকাশের মতন দর্শকের চক্ষে চমক লাগিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘোরতর অন্ধকারে ফেলে দেয় না।

২

তা'রপর থেকে শোভনার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত। কোনদিন দু'-চারটে মামুলি কথা হ'ত, কোনদিন বা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা বুঝিয়ে দিতাম, কি অঙ্ক ক'ষে দিতাম।

তোমরা বোধ হয় ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছ, যে প্রথম দর্শনেই শোভনার প্রতি আমার প্রণয়-সঞ্চার হয়েছে,—এখন কেবল ওথেলোর মতন, বঙ্গ-বীরের একমাত্র পৌরুষ—পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় দিয়ে চলেছি,—ডেস্‌ডিমনার হৃদয় জয় করবার জন্যে। মোটেই না। শোভনাকে দেখে মনে একটা আনন্দ অনুভব করতাম বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আকাশের চাঁদকে দে'খে শিশুর মনে যে আকাঙ্খা জেগে ওঠে, বয়স্ক লোকের তা' হয় না,—সে শুধু দে'খেই সুখী। আমিও গোড়া থেকে শোভনাকে এক ভিন্ন জগতের জীব ব'লেই বুঝেছিলাম; তাই কোন অসম্ভব আশা বা কল্পনা যা'তে মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে না স্থান পায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলাম। ব্যাপার কিন্তু দাঁড়িয়েছিল অন্য রকম,—সে কথা পরে বল্‌ছি।

এই ভাবে প্রায় দুটো বছর কেটে গেল। তা'র মধ্যে শোভনা ম্যাট্রিক্‌ পাস করে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। আমরা দুজনেও এম্, এ পাস করেছি। বরাবর যে স্থানটি আমার অধিকার করা ছিল, এবারেও তা' থেকে বেদখল হইনি। এদিকে ল-কলেজে যাওয়াও শেষ হয়েছে, এখন কেবল আইনের শেষ পরীক্ষাটি দেওয়া বাকী। সুতরাং, আমরা এখন যেন জেল-খালাসী কয়েদীর মতন পুলিশের নজর-বন্দিতে আছি,—নূতন স্বাধীনতাটুকু ষোল-আনা উপভোগ করতে পাচ্চি না।

সনৎদের বাড়ী তেমন নিয়মমত যাওয়া-আসা এখন আর হয় না। গেলেও সব দিন তা'র দেখা পাওয়া যায় না। দেখা হয় শোভনার সঙ্গে, আর একজন নূতন লোকের সঙ্গে,—শোভনার মেজদিদি অপর্ণা। শুন্‌লাম তাঁর স্বামী,—পশ্চিমাঞ্চলের কোন কলেজের প্রফেসর,—কি একটা নূতন বিদ্যা শিখ্‌বার জন্যে জর্ম্মনী যাত্রা করার সময়, স্ত্রী-রত্নটি শ্বশুরালয়ে গচ্ছিত রেখে গেছেন।

সনৎকে যেদিন বাড়ীতে পাওয়া যায়, সেদিন বেশ মজলিস বসে। যে দিন সে না থাকে, শোভনাদের সঙ্গে দু'চারটে বাজে কথা কয়ে চলে আসি। যেদিন শোভনার সঙ্গেও দেখা না হয়, সেদিন কিন্তু কি-রকম একটা আস্বস্তি বোধ হয়,— সকালে উঠে চা না পেলে, কিম্বা চশমাখানা খুঁজে না পেলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম।

একদিন কথায় কথায় শোভনার পড়াশুনার কথা উঠ্‌ল। সনৎ বল্‌লে,—"দেখ সঞ্জীব, শোভনার লেখাপড়ায় তেমন উন্নতি হচ্ছে ব'লে ত মনে হয় না। একটু-আধটু যা' দেখেছি তা' তেমন আশাপ্রদ নয়। তা'র উপর লজিক্‌টা নাকি ও তেমন বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু আমি ত ও-রসে বঞ্চিত, তুমি যদি একটু দেখ।

আমি বল্‌লাম,—"বেশ, মাঝে মাঝে দরকার মত একটু আধটু বলে দেবো এখন। ও এমন কিছু শক্ত জিনিষ ত নয়।"

তারপর মাঝে মাঝে একটু-আধটু লজিক্ পড়ানো চল্‌ল।

একদিন ভাব্‌লাম একটু পরীক্ষা ক'রে দেখি। সহজ দে'খে দু'-চারটে প্রশ্ন কর্‌লাম, বল্‌তে পার্‌লেনা। শেষে

নিজেই বোঝা'তে আরম্ভ কর্‌লাম। শোভনা চুপ্‌টি ক'রে শুনে গেল। কিন্তু মন দিয়ে শুন্‌ছে কি না জান্‌বার জন্যে, মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেলাম। দেখি সে তখনও আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। তারপর যখন বুঝ্‌লে আমি চুপ ক'রে আছি, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে।

বুঝ্‌লাম তেমন মনযোগ দেয়নি। বেশ মন দিয়ে শুন্‌তে ব'লে, আবার সেই সব কথা বোঝা'তে আরম্ভ কর্‌লাম। এবার সে আর মুখ তুল্‌লে না, হেঁট হ'য়ে খাতার উপর পেন্সিল দিয়ে আঁক কাট্‌তে লাগ্‌ল। খানিক ব'লে, ছোট একটা প্রশ্ন কর্‌লাম। কিন্তু শোভনা কোন উত্তর দেয় না, একমনে আঁক কেটে যায়। বল্‌লাম,—"কি, বল্‌তে পার না ?" তখন তা'র চমক ভাঙ্‌ল; ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে বল্‌লে,—"আমাকে কিছু জিজ্ঞাস কর্‌লেন ?"

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়্‌লাম। সনৎও বসেছিল; সে হো হো ক'রে হেসে ব'লে উঠ্‌ল,—"যাক্, সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে—"

সনৎকে এক ধমক দিয়ে বল্‌লাম, "থাম,—তুমি আর ব'লনা। কলেজে লেক্‌চার শুন্‌তে শুন্‌তে তুমিও কি অন্যমনস্ক হ'তে না, গল্প কর্‌তে না ?"

তারপর শোভনার দিকে ফিরে বল্‌লাম,—"তবে একটা কথা বলি। লজিক্‌টা না হয় ছেড়েই দাও। ওটা নতুন জিনিষ, হয়ত তেমন সুবিধা কর্‌তে পার্‌বে না। তা'র চেয়ে বরং সংস্কৃত নিলে হয়,—কতকটা ত পড়াই আছে—"

সনৎ ব'লে উঠ্‌ল,—"হ্যাঁ, আর কিছু না হয়, মুখস্থ ক'রেও মেরে দেওয়া যায়।"

কিন্তু শোভনা কোন কথাই কানে তুল্‌লে না। তাড়াতাড়ি বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে, মহা অভিমান-ভরে সেখান থেকে চ'লে গেল। তা'র মেজ-দিদি তা'র পিছনে ছুট্‌লেন,—সনৎ বসে মুখটিপে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সহজে উড়িয়ে দিতে পার্‌লাম না। বাসায় ফিরে এসে, একটু স্থির হয়ে কথাটা বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। শোভনার হয়েছে কি? তা'র এ রকম আচরণের অর্থ কি? শুধু কি লজিক্ বুঝ্‌তে পারে না ব'লে, না আর কোন গূঢ় কারণ আছে? মনের মধ্যে একটা ঘোর সংশয় জ'মে উঠ্‌ল। তবে কি শোভনা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে? কিন্তু আমি ত তা'র কোনও সুযোগ দিইনি। আমাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান তা' গোড়াতেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, আর বরাবর সেই ব্যবধান বজায় রেখে এসেছি। কিন্তু আজ মনে হ'ল, আমারই একটা বিষম ভুল হয়েছে। আমি নিজেকেই বাঁচা'বার উপায় করেছি, সেও আত্মরক্ষার কোন উপায় করেছে কি না, তা' ত দেখিনি। যে ব্যবধানকে আমি এত বড় করে দেখেছি, সেদিকে তা'র হয়ত নজরই পড়েনি। সরল-প্রাণা বালিকা সে, হয় ত তা'র হৃদয়-প্রবাহে নিশ্চিন্ত মনে গা' ভাসিয়ে দিয়ে এতক্ষণ অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে!

এ অনুমান সত্য হ'লে আমার মত যুবকের পক্ষে খুব একটা গর্ব্বের বিষয় হ'তে পার্‌ত। কিন্তু সে ভাবটা আমার মনে এল না। বরং একটা তীব্র আত্মগ্লানিতে হৃদয় ভ'রে উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম, হয় ত এখনও উপায় আছে,—কিছুদিন সনৎদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ ক'রে দেখা যা'ক। পরীক্ষারও বেশী দেরী ছিল না, সুতরাং সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করা বেশ সহজ হয়ে গেল।

৩

পরীক্ষা হয়ে গেল। বিনা কাজে কল্‌কাতায় ব'সে থাক্‌বার কোন দরকার নাই ভেবে, একবার দেশে চ'লে গেলাম। ফের্‌বার কোন তাড়া ছিল না, সুতরাং সেবার প্রায় দেড় মাস বাড়ীতে কেটে গেল।

কল্‌কাতায় ফিরে এসে একবার সনৎদের বাড়ী গেলাম, দেখা হ'ল না। লাইব্রেরী-ঘরে অপর্ণা ও শোভনা দু'জনেই ছিল, তা'রা ডেকে বসালে। পরস্পর কুশল-প্রশ্নের পর আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে শোভনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—"লজিক্‌টা একটু আয়ত্ত হ'ল, না ছেড়ে দেওয়াই স্থির?"

তা'কে আজ অনেক দিন পরে দে'খে মনে হ'ল তা'র চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে। রোগা হয়েছে কি না ঠিক বোঝা গেল না, তবে মুখ-খানা একটু বিষন্ন, ম্লান মনে হ'ল। মুখ না তুলেই সে বল্‌লে—"না, লজিকের আশা ত ছেড়েই দিয়েছি,—আমার দ্বারা আর কিছুই হ'বে না। পড়া-শুনা একেবারেই ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু দাদা কিছুতেই শুন্‌বে না। আপনি একবার দাদাকে বল্‌বেন?"

বেদনাভরা চোখ দু'টি তুলে এই প্রশ্ন ক'রেই, সে চোখ নামিয়ে নিলে। অপর্ণাও তা'র কথা সমর্থন করে বল্‌লেন,—"সত্যি, সঞ্জীব বাবু, এটা দাদার অন্যায় নয়? মেয়েছেলেকে ওষুধ গেলানোর মতন জবরদস্তি ক'রে লেখাপড়া শেখানো কেন?"

আমি বল্‌লাম,—"হ্যাঁ, তা' বটে। বেটাছেলের বেলায় সেটা দরকার হ'তে পারে, কারণ তা'কে ক'রে খেতে হ'বে। মেয়েছেলেদের বেলায় ত তা' নয়। তা'র লেখাপড়া শেখা কেবল মানসিক উন্নতির জন্যে। আচ্ছা, আমি সনৎকে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

কিন্তু সনৎকে বুঝা'ব কি, সে উল্‌টে আমাকে বল্‌লে,—"তুমি বোঝ না। মেয়েছেলেকে পরীক্ষা পাস কর্‌তে হ'বে এমন কোন কথা নেই বটে। কিন্তু পড়াশুনা বজায় রেখে যা'ক না, যৎটুকু শিখ্‌তে পারে ততটুকুই লাভ। আর আমাদের বাঙালীর ঘরের ব্যাপার জানই ত। ছেলেমেয়ে যতদিন লেখাপড়া করে, মা-বাপ দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন। যাই পড়াশুনা ছাড়া, অমনি ছেলের বেলায় চাক্‌রি, আর মেয়ের বেলায় বিয়ে! লেখাপড়া ছেড়ে ব'সে থাক্‌লে, মা এখনি শোভনার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লাগ্‌বেন,—তা' আমি বেশ জানি। তা'র চেয়ে চলুক না,—হেসে-খেলে যে ক'টা দিন যায় তা'ই লাভ।"

এ নিয়ে আর বেশী তর্ক করা গেল না, তবে সনৎকে অঙ্গীকার করিয়ে নিলাম, যে পড়াশুনার জন্যে বেশী পীড়াপীড়ি কর্‌বে না।

সনতের সঙ্গে আজকাল দেখাশুনা খুব কমই হয়। আইন-পরীক্ষার পর থেকে, শিকলি-কাটা পাখীর মতন, তা'র নূতন স্বাধীনতাটুকু সে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করছে। বাড়ীতে খুঁজ্‌লে তা'র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু পথে-ঘাটে অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন-তখন দেখা হয়।

একদিন বৈকালে তা'র বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌লাম সে বেরিয়ে গিয়েছে। ফটকের কাছ থে'কেই চ'লে আস্‌ছিলাম, এমন সময় ভিতর থেকে ডাক এল। দেখ্‌লাম অর্পণা একাই ব'সে কি একখানা বই পড়্‌ছেন। তিনি তামাসা ক'রে বল্‌লেন,—"চুপ্‌চাপ্‌ পালাচ্ছিলেন যে বড়? সন্দেশ খাওয়া'তে হ'বে, সেই ভয়ে বুঝি?"

তখন সবেমাত্র আইন-পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে,—আমরা দু'জনেই পাস হয়েছি। আমি হেসে বল্‌লাম,—"দু'টো সন্দেশ খেয়েই যদি

আপনারা সুখী হন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু সে দাবী ত আমারও আছে। তবে, দাবী করি কা'র কাছে, আসামীর ত দেখা নেই।"

অপর্ণা বল্‌লেন,—"আসামী বোধ হয় বাড়ীতেই আছে। আপনি বসুন, দেখি। সন্দেশটা বোধ হয় দু'তরফাই জুটবে। আমাদের তা'ই লাভ, আমরা ত ইতরে জনাঃ!"

বইখানা যেখানে পড়্‌ছিলেন, সেখানে একখানা চিঠি গুঁজে রেখে, টেবিলের উপর ফেলে, তিনি ছুট্‌লেন বাড়ীর ভিতর।

আমি একলাটি চুপ ক'রে ব'সেই আছি; কেউ আসেও না, কোন সাড়া-শব্দও নাই। টেবিলের উপর যে বইখানা পড়েছিল, তুলে নিয়ে পাতা উল্‌টা'তে উল্‌টা'তে চিঠিখানার উপর চোখ পড়্‌ল। দে'খেই চম্‌কে উঠ্‌লাম। খামের উপর সনতের বাবা মুখার্জ্জি সাহেবের নাম-ঠিকানা লেখা, কিন্তু লেখাটা অবিকল আমার বাবার হাতের লেখার মতন! এ চিঠি কি তবে তা'রই লেখা? কিন্তু এঁদের যে পরস্পর আলাপ-পরিচয় আছে তা' ত কখনও শুনিনি। কিংবা এ আর কারুর লেখা? কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানি, কোন দু'জন লোকের চেহারা যেমন এক রকমের হয় না, হাতের লেখাও তেমনি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে, তাড়াতাড়ি খাম থেকে চিঠিখানা বা'র ক'রে ফেল্‌লাম। ভাব্‌লাম, তেমন কিছু গোপনীয় চিঠি হ'তে পারে না, তা' হলে বাপের চিঠি মেয়ের হাতে থাকবে কেন?

প্রথমেই চিঠির তলার দিকে নজর পড়্‌ল। তাই ত বটে! নাম সই করা রয়েছে, শ্রীপরেশ নাথ রায়! কাজেই সবটা না পড়লে চলে না।

যতদূর মনে পড়ে বাবা লিখেছেন,—"আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব ক'রে আমাকে সম্মানিত করেছেন। সঞ্জীব শিক্ষিত উপযুক্ত পুত্র, তা'র ইচ্ছার উপর আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে, যিনি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের জননী হ'বেন, তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।"

দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথার ভিতর ছুটে এসে তোলপাড় করতে লাগ্‌ল।

তাড়াতাড়ি চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে একটু সহজ ভাবে বস্‌বার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে,—"এই যে মশায়, আপনার আসামী হাজির!" বলে, অপর্ণা পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরে এলেন। পিছনে আর একজন কে ছিল, চোখ তুলে চেয়ে দেখ্‌তে পার্‌লাম না, আন্দাজে বোধ হ'ল,—শোভনা।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাইরে থেকে সনৎও এসে পড়েছে। একসঙ্গে দু'দিক থেকে আক্রমণ,—আমার অবস্থা তখন ওয়াটার্লু'তে নেপোলিয়নের মতন! কি-রকম যে হ'য়ে গেলাম, নিজেকে কিছুতেই আর সাম্‌লা'তে পারি না,—পালা'তে পার্‌লে বাঁচি! কিন্তু সনৎ কিছুতেই ছাড়্‌বে না।

এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার কর্‌লেন শেষে অপর্ণা; বল্‌লেন,—"না দাদা, ওঁকে ছেড়ে দাও। উনি চলেই যাচ্ছিলেন, আমি এতক্ষণ জোর ক'রে বসিয়ে রেখেছিলাম।" তারপর আমার কাছে স'রে এসে একটু চাপা গলায় বল্‌লেন—"এখন যান্, খোলা হাওয়ায় গিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। নেহাৎ কাঁচা চোর!"

বিনামেঘে বজ্রাঘাত, চোখে না দেখ্‌লেও, ঢের শোনা গিয়েছে; কিন্তু এমন বিনামেঘে রামধনুর উদয় কেউ কখনও দেখেছ কি?

সেদিনকার সেই সোনালী সন্ধ্যায়, আমার দেহে-প্রাণে, আকাশে-ভূতলে, রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সম্পদ্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাসায় ফির্‌লাম।

৪

তারপর থেকে সনৎ এসে প্রায়ই আমাকে তা'দের বাড়ী ধ'রে নিয়ে যায়। সেখনে ব'সে খানিক গল্প-গুজব ক'রে, চা খেয়ে চ'লে আসি। কিন্তু আগেকার মতন আর তেমন সহজভাবে মিশ্‌তে পারি না। শোভনাও বড় একটা আসে না। তবে তা'র মেজদিদি মাঝে মাঝে তা'কে এক অদ্ভুত উপায়ে ধ'রে আনেন,—পর্দ্দার ভিতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে, যাদু-করের মতন তা'কে হাত ধ'রে টেনে এনে খাড়া ক'রে দেন। সে একটু ব'সে-দাঁড়িয়ে এক সময়ে অলক্ষিতে স'রে পড়ে। আবার তেমনি ক'রে হাত বাড়িয়ে টেনে আনা। এই রকম ক'রে কিছুদিন যায়।

ইতিমধ্যে একদিন দেশ থেকে বাবা-মা দুজনেই এসে উপস্থিত। তাঁ'রা এখানে ওখানে কত জায়গায় ঘুর্‌লেন,—কোথাও বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, কোথাও বা নিজেরাই যান।

এম্-এ পাশ করার পর থেকে ডেপুটি-গিরির জন্যে একটু চেষ্টা করা হচ্ছিল ; এবার একটু ভাল ক'রে লাগা গেল। যে দু'চার জন বড় বড় লোকের সঙ্গে বাবার একটু জানাশুনা ছিল, দু'জনে তাঁ'দের কাছে গিয়ে একটু উমেদারি করা গেল। গৃহস্থ ঘরের ছেলে, ওকালতিতে কিছু সুবিধা হ'বে ব'লে কেউ তেমন আশা দেন না ; তাই একটা ভাল চাকরির জন্যেই বিশেষ চেষ্টা। কিন্তু বলা যায় না, শেষ পর্য্যন্ত যদি ওকালতিই কর্‌তে

হয়, তাই একজন বড় উকিলের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় ক'রে আসা গেল। এই রকম নানা কাজে ঘোরাঘুরি ক'রে, তাঁ'রা দেশে ফিরে গেলেন।

আমার কিন্তু দিন দিন একটা উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শোভনার কথা যখন মোটেই ভাব্‌তাম না, ভাব্‌তাম কেবল তা'র লজিকের কথা, তখন বেশ ছিলাম। কিন্তু সেই চুরি ক'রে চিঠি পড়ার দিন থেকে, শোভনার চিন্তাই তিল তিল ক'রে বাড়্‌তে লাগ্‌ল। তা'কে আজকাল ভিন্ন চক্ষে দেখ্‌তে, ভিন্ন রূপে ভাব্‌তে আরম্ভ করেছি, কিন্তু এখন আর তা'কে কাছে পাই না। মরীচিকা বোধে এতদিন যা'কে সুমুখে দে'খেও কাছে যেতে চাইনি, তা'কে যখন স্বচ্ছ শীতল সরোবর ব'লে জান্‌লাম, তখন থেকে সে মরীচিকার মতনই ক্রমশঃ দূরে স'রে যেতে লাগ্‌ল! শুধু তাই নয়,—যে কথা শোন্‌বার জন্যে সলজ্জ আগ্রহ নিয়ে সনৎদের বাড়ী যাই, সে সম্বন্ধে কেউ আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। তবে কি কথাটা চাপা প'ড়ে গেল? না, আমাকে নিয়ে শুধু একটু নিষ্ঠুর কৌতুক করা হয়েছে?

এই রকম সংশয়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাট্‌ছে, এমন সময় একদিন সনৎদের বাড়ী যাওয়া মাত্রেই অপর্ণা বল্‌লেন,—"আজ মশাই, আর এক প্রস্ত সন্দেশ খাওয়া'তে হচ্চে!" কথাটার অর্থ বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছি দে'খে অপর্ণা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। তারপর আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্‌লেন,—"এটা প'ড়ে দেখুন, বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

চিঠিখানায় দেখ্‌লাম বাবা লিখেছেন যে শোভনাকে দে'খে তাঁদের বেশ ভাল লেগেছে, মেয়েটি বড় সুলক্ষণা। বিবাহে তাঁ'দের সম্পূর্ণ মত আছে।

চিঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে অপর্ণা কিছুক্ষণ মুখের পানে চেয়ে দে'খে বল্লেন,—"কেমন? এইবার······আচ্ছা, সন্দেশটা না হয় পরে হ'বে, এখন শাঁখটা বাজাই?"

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তিনি ছুট্লেন দে'খে, আমি বারণ কর্তে গেলাম,—"না না, কি সব ছেলেমানুষি করেন!" সনৎ ধ'রে বসালে, বললে,—"তুমিও ত আচ্ছা পাগল দেখ্ছি! বস।"

শাঁখটা সত্যসত্যই আর বাজ্‌ল না। অল্পক্ষণ পরে অপর্ণা ফিরে এলেন,—সঙ্গে তাঁ'র মা। তাঁ'কে ইতিপূর্ব্বে দু'চার বার দেখেছি বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আজ তিনি পরম আত্মীয়ের মতন কাছে এসে বস্‌লেন, বল্লেন,—"কি বল বাবা? সবই ত জান, এখন তোমার কথার উপরই নির্ভর।"

আমি একটু ভেবে নিয়ে বল্‌লাম,—"যদি সকলের তা'ই ইচ্ছা হয়, ত আমার কিছু বল্‌বার নেই।" শুনে তিনি যেন একটু সন্তুষ্ট হ'লেন, খুঁটিয়ে আমাদের ঘরের কথা অনেক জেনে নিলেন। তারপর, উঠে যা'বার সময় বল্‌লেন,—"তা' হ'লে ওঁকে বলি, তোমার বাবাকে লিখে দিন স্থির করুন।"

আমি একটু বিনয় ক'রে বল্‌লাম,—"দিন-কতক অপেক্ষা কর্‌লে ভাল হয় না? আমার একটা কাজকর্ম্মের কিছু ব্যবস্থা না হ'লে—"

সনৎও আমার কথায় সায় দিয়ে বল্‌লে,—"না না, তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই। সে আমরা ধীরে-সুস্থে সব ঠিক ক'রে নেব এখন।"

মা চ'লে গেলে, অপর্ণাও উঠ্‌লেন, বল্‌লেন,—"এইবার তা'হলে আসামীকে তলব করতে হয়।" সনৎ ধমক দিয়ে বল্‌লে,—"দেখ্‌ অপর্ণা, বেশী বাড়াবাড়ি করিস্‌ ত চাঁটি খাবি !"

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্‌লেন,—"আচ্ছা, সে দেখা যা'বে ! দাঁড়াও না, এবার তোমার পালা। আমি এই কালই ভুবন চাটুয্যের বাড়ী যাচ্ছি।" দাদাকে শাষিয়ে অপর্ণা চলে গেলেন।

শেষ কথাটার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে, সনৎকে চেপে ধর্‌তে, সে বল্‌লে,—"ও কিছু নয়। আইবুড়ো ছেলে-মেয়ে ঘরে থাকলে মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে, একটা মনগড়া বিয়ের সম্বন্ধ দাঁড় করিয়ে, তাই নিয়ে ঘোঁট পাকানো।" কথাটা এই রকম ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও, জেরার মুখে প্রকাশ হয়ে গেল যে ব্যাপারটা আরও বেশীদূর অগ্রসর হয়ে, পূর্ব্বরাগ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। আমার কাছে এতদিন এ সব লুকিয়ে রেখেছিল ব'লে সনৎকে খুব খানিকটা ভর্ৎসনা করলাম।

অপর্ণা শোভনাকে আন্‌তে গেলেন; কিন্তু আজ আর যাদুকরের মতন হাত বাড়িয়েই পর্দ্দার আড়াল থেকে টেনে বা'র করতে পারলেন না,—অনেক্ষণ বিলম্ব হ'ল। যাই হ'ক, আসামীকে এনে হাজির ক'রে বল্‌লেন,—"এই ! নমস্কার কর্‌।......আরে গেল যা ! কথা শোনে না। নমস্কার কর্‌,—করতে হয় !" শাসনের চোটে শোভনা কলের পুতুলের মতন হাত দু'টি জোড় ক'রে কপালে ঠেকালে।

তারপর আমার কাছে স'রে এসে অপর্ণা বল্‌লেন,—"সঞ্জীববাবু, এবার আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।......হ্যাঁ হ্যাঁ, করতে হয় !"

সনৎ ধমক দিয়ে উঠল,—"ধ্যাৎ!" ওদিকে শোভনাও নিঃশব্দে স'রে পড়্‌ল।

"এই রে, আসামী পালায়!" ব'লে অপর্ণাও ছুট্‌লেন।

৫

হৃদয়ে গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফির্‌লাম।

ঘর খুলে আলো জ্বালতেই, দেখি মেঝের উপর একখানা চিঠি প'ড়ে আছে। লম্বা-চৌড়া খাম দেখে বুঝ্‌লাম, সরকারী অফিসের চিঠি। খুলে প'ড়ে দেখ্‌লাম,—আমি ডেপুটী-গিরিতে বাহাল হয়েছি, সোমবার দিন অফিসে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে হ'বে।

চিঠি প'ড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লাম। এ হ'ল কি! একদিনের এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন সব অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এক সঙ্গে এসে পড়্‌ল! জানি না, এমন শুভদিন আর কারুর অদৃষ্টে কখনও ঘটেছে কি না। ভাব্‌লাম আরও কোন শুভ-সংবাদ আস্‌বার সম্ভাবনা আছে কিনা। মনে প'ড়ে গেল, একখানা লটারির টিকিট কিনেছি। তা'তে কোন বাজী জেতার খবর আসেনি ত? চিঠি কি টেলিগ্রাম?—ঘরের মেঝেটা আর একবার ভাল ক'রে দেখ্‌লাম। কই না! তবে আর হ'ল না। তেমন কিছু হ'লে, ঠিক আজকের দিনেই তা'র খবর আস্‌ত। তা' যখন এল না, তখন আর আশা নাই। তা নাই থাক, আজ যা' পেয়েছি লটারির দশ-বিশ লাখ তা'র কাছে তুচ্ছ! আজ আমার মতন ভাগ্যবান জগতে কে আছে?

সে রাত্রে কিছুতেই চক্ষে ঘুম এল না। একটার পর একটা ক'রে, নানা চিন্তা এসে জুটতে লাগ্‌ল। শেষে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—আচ্ছা, এই যে দু'-দুটো ঘটনা একসঙ্গেই ঘ'টে গেল, তা'র অর্থ কি? এটা কি শুধু দৈব-যোগে, না মানুষেরও কিছু যোগ আছে? আগে তেমন খেয়াল হয়নি, কিন্তু এখন মনে প'ড়ে গেল, শোভনাদের বাড়ী আজ বাবার যে চিঠিখানা দেখ্‌লাম, তা'তে দশ-বারো দিন আগেকার তারিখ আছে। এতদিন পরে, ঠিক আজই এই চিঠিখানা দেখিয়ে, বিয়ের কথাটা পাকা ক'রে নেবার কারণ কি? তবে কি এতদিন ওঁরা ভিতরে ভিতরে খবর রাখ্‌ছিলেন, আমার চাকৃরি জোটে কি না? তাই বুঝি পাকা খবরটা জেনে তবে আজ······? আর তা' না হ'লে কি বিয়ের কথাটা একেবারেই চাপা প'ড়ে যেত? তাই যদি হয়, তা' হ'লে সেটা কি নিতান্ত হীন দোকানদারী নয়?

আর শোভনা? এতদিন যা'কে অমূল্য রত্ন ভেবে আমার মতন দরিদ্রের আয়ত্তের বাইরে ব'লে মনে করৃতাম, সে সামান্য পণ্যদ্রব্যের মতন এত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় হ'বার জন্যে অপেক্ষা করৃছিল? তা'র বাপ-মা যাই করুন, তা'র নিজেরও কি কোন ইচ্ছা বা মতামত নেই? সে ত সাধারণ হিন্দু-ঘরের ছোট্ট মেয়েটি নয়। তবু আমার প্রতি তা'র মনের ভাব কি রকম তা' ত কিছুই জানৃতে দিলে না। এক সময়ে শোভনার আচরণ দে'খে ভেবেছিলাম বটে, যে সে আমার অনুরাগিণী। কিন্তু হয় ত সেটা আমারই ভ্রম,—আমার আত্মাভিমানের একটা অলীক সৃষ্টি মাত্র। তা' যদি না হ'বে তবে এত দিনের মধ্যে তা'র অনুরাগের কোন লক্ষণ দেখ্‌লাম না কেন? চোখের একটা ইঙ্গিতে, মুখের হাসিতে, প্রণয়ের দীর্ঘ ইতিহাস যে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে যায়,—তা' কই?

তা'র চেয়ে ভাল ছিল,—হিন্দুর ঘরে সকলের যেমন হয়ে থাকে,—একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতাকে বরণ ক'রে নিয়ে, ধীরে ধীরে তা'র রহস্যের আবরণ খুলে, ক্রমে তা'র ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া; তারহীন বীণায় তার সংযোগ ক'রে, নিজের হৃদয়-সঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে সুর বেঁধে নেওয়া। কিন্তু এ ত তা' নয়। যৌবনের পুলক-পরশে এ বীণায় যে কি একটা সুর বাঁধা হ'য়ে গেছে। সেটা শুন্‌তে পাচ্ছি না, হয় ত আমার সুরে সে সুর মিল্‌বে না, চিরকাল বে-সুরোই বাজ্‌তে থাক্‌বে!

এই রকম অসম্বদ্ধ বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে সারা রাত কেটে গেল।

ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে, মাথায় খানিকটা জল ঢেলে, চলে গেলাম গড়ের মাঠে,—খোলা হাওয়ায় মাথাটা যদি ঠাণ্ডা হয়। মাঠে একটু বেড়িয়ে ক্লান্তিবোধ হ'ল, ইডেন-গার্ডেনে একটু নির্জ্জন স্থান দেখে বেঞ্চের উপর বস্‌লাম। ব'সে ব'সে কতকগুলো সিগারেট্ পুড়িয়ে যখন উঠ্‌লাম, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। ভাব্‌লাম বাসায় ফিরে স্নানাহার ক'রে, শরীরটা একটু স্নিগ্ধ হ'লে, একবার ঘুমের চেষ্টা কর্‌তে হবে।

গলির মোড়ে পানের দোকান দেখে মনে পড়্‌ল, সিগারেট্ ফুরিয়েছে, কিন্‌তে হ'বে। একটা খোলার বাড়ীর একটা কোণে, খান-কতক তক্তা লাগিয়ে, ছোট একটি কুঠরির মতন ক'রে নিয়ে, তাইতে এই পানের দোকান হয়েছে। পানওয়ালাকে দোকানে দেখ্‌লাম না, ব'সে আছে একজন স্ত্রীলোক,—বোধ হয় তা'র স্ত্রী। দোকানে তা'কে অনেক-বার ব'সে থাকৃতে দেখেছি, আমাদের গলির ভিতরেও মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা কর্‌তে দেখেছি,—বোধ হয় ঐ গলিতেই তা'র বাসা। কিন্তু দোকানের সুমুখে দাঁড়িয়ে আজ তা'র যে মূর্ত্তি দেখ্‌লাম,—চক্ষু জুড়িয়ে

গেল। সুন্দরী না হ'লেও, ভদ্রঘরের মেয়ের মতনই তা'র চেহারা। চওড়া লাল-পাড় শাড়ীতে তা'র যৌবন-পুষ্ট দেহখানিকে বেশ ক'রে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু তা'তেও তা'র সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েনি। ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে, সীমন্তে দীর্ঘ উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে যখন সিগারেট্ চাইলাম, তখন একটু সলজ্জ হাসি হেসে এমন আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লে,—"এই দি," মনে হ'ল তুচ্ছ এক প্যাকেট সিগারেট্ নয়, যেন তা'র যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে উপহার দেবার জন্যে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। সিগারেট্ নিয়ে একটা সিকি দিলাম, কিন্তু তা'র বাকী পয়সা ক'টা নিতে ভুলে গিয়ে তা'র মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ ছিলাম জানি না ; সে চোখ তুলে আবার একটু হেসে, যখন বল্‌লে,—"পান চাই কি ?"—তখন জ্ঞান হ'ল, তাড়াতাড়ি পয়সা ক'টা তুলে নিয়ে ছুট্‌লাম।

মনে পড়্‌ল শোভনার কথা। এই সামান্য পানওয়ালী রূপে, গুণে,—হয়ত চরিত্রেও, তা'র চেয়ে কত হীন। কিন্তু এরও একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। হায় ! শোভনার কাছেও যদি এমনি একটু মধুর হাসি, একটা কোমল চাহনি পেতাম, প্রাণে কি যে এক আনন্দের সাড়া প'ড়ে যেত !

স্নানাহার ক'রে শরীর স্নিগ্ধ হ'ল, কিন্তু ঘুম এ'ল না। বরং আর একটা আতঙ্ক এসে দেখা দিল,—সনৎ কোন সময়ে বা এসে পড়ে। এ রকম মানসিক অবস্থায় তা'র সঙ্গে দেখা হওয়া, বা তা'র বাড়ীতে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে হ'ল না। কাজেই বাসা ছেড়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। সারাদিন লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে সন্ধ্যার অনেক পরে বাসায় ফির্‌লাম।

গলির মোড়ে এসে পানের দোকানের দিকে একবার না চেয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না। পথে ভীড় ছিল না, দোকানে খরিদ্দার ছিল না, পানওয়ালী একা ম্লান মুখে আর এক দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। আমাকে দেখেই তা'র চোখে-মুখে সহসা যেন একটা ক্ষীণ জ্যোতি ফুটে উঠ্‌ল, তারপর ধীরে ধীরে সে চোখ নামিয়ে নিলে।

সে রাত্রে,—মাথাটা ক্রমে একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল বলেই হ'বে, কি সারাদিনের হাঁটাহাঁটিতে শরীর ক্লান্ত ছিল ব'লেই হ'বে—বেশ ঘুম হয়েছিল। সকালে বিছানা থেকে উঠে মনে হ'ল দেহের ও মনের গ্লানি অনেকটা কেটে গিয়েছে,—যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠ্‌লাম মাত্র!

সেদিন রবিবার। কাল অফিসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হ'বে, এখন থেকে তা'র জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লাম। দেখ্‌লাম একটা ভদ্র রকমের পোষাক না হ'লে ত চলে না। তাই আহারাদি সেরে চ'লে গেলাম চাঁদনী—পোষাক কিন্‌তে।

সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বড়-মামাব সঙ্গে। তিনি বর্দ্ধমানে ওকালতি করেন; কি একটা দরকারে কাল এসেছেন,—বৌবাজারে তাঁ'র এক সম্বন্ধীর বাসায় উঠেছেন। তিনি কিছুতেই ছাড়্‌লেন না; আমাকে সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে, একরাশ জিনিষপত্র কিনে ফির্‌লেন। তারপর সন্ধ্যার সময় তাঁ'কে মালপত্র সমেত ট্রেণে তুলে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

বাসায় ফের্‌বার সময় দূর থেকেই মোড়ের সেই দোকানটির দিকে নজর পড়্‌ল। কিন্তু কাছাকাছি এসে আর সেদিকে চাইলাম না, বেশ জোরে জোরে পা ফেলে অতি গম্ভীর ভাবে চ'লে গেলাম। কিন্তু যা'কে

এমন নির্ম্ম অবহেলা দেখিয়ে চ'লে এলাম সে কি ভাব্‌ছে এ চিন্তাও মনে উদয় হ'ল।

দীর্ঘকাল পরে এবার শোভনাকেও মনে পড়্‌ল। কিন্তু তা'তে হৃদয়ের একটা বিস্মৃত বেদনা যেন নূতন হয়ে জেগে উঠ্‌ল। জোর ক'রে মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেলাম। শেষে কি আবার মাথা খারাপ ক'রে বস্‌ব !

সোমবার। যথা সময়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তাঁ'র দর্শন-লাভ হ'ল। কথাবার্ত্তা কয়ে সাহেব যেন একটু খুসী হ'লেন। চাকুরিতে পাকা হয়ে বস্‌বার জন্যে আমার কি কি করা দরকার, সব বুঝিয়ে দিলেন। কিছু উপদেশও দিলেন। বল্‌লেন,—"বাবু, তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তুমি একটু লাজুক আছ, আর বোধ হয় একটু ভীতু। সেটা আর কিছু নয়, নিজের শক্তির উপর তোমার আস্থা নেই, সাহস নেই। জোয়ান বয়স, এ সময়টা বেশ ফুর্ত্তিতে থাক্‌বে,—কিছু ভয় কর্‌বে না। সময়ে সময়ে হয়ত অনেক অন্যায় কাজও কর্‌তে হ'বে; তা'তে যদি ভয় পেয়ে যাও, তবেই গেলে ! প্রাণে ফুর্ত্তি আন, সাহস আন !"

বেশ ক'রে পিঠ ঠুকে দিয়ে আমার শরীরে ফুর্ত্তি ও সাহসের সঞ্চার ক'রে, তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হ'ল, বাস্তবিক আমি যেন আর সে মানুষ নই !

দেশে বাবার কাছে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে, তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ছুট্‌লাম। পোষাক ছেড়ে এখনি আবার বেরুতে হ'বে।

কাল বৈকালে নাকি সনৎ আমাকে খুঁজ্‌তে এসেছিল, আজও যদি আসে! না, মনটা আর একটু স্থির না হ'লে তা'দের কাছে দেখা দেওয়া হ'বে না।

গলির মোড়ে পানের দোকানে পানওয়ালী সেই রকম চুপটি ক'রে ব'সে আছে। যা'বার সময় একবার মাত্র তা'র দিকে চেয়েছিলাম। দেখ্‌লাম সে ফিক্ ক'রে হেসে, মুখে আঁচল চাপা দিলে; কিন্তু কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকেই চে'য়ে রইল।

পোষাক ছেড়ে বাসা থেকে বেরিয়েই মনে পড়্‌ল, সিগারেট্ ফুরিয়েছে। ..... না এ দোকানে আর কিন্‌ব না, দোকান ত ঢের আছে। হঠাৎ সাহেবের উপদেশ মনে প'ড়ে গেল,—'প্রাণে ফুর্ত্তি আন, সাহস আন'। সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে সেই দোকানেই সিগারেট্ কিন্‌লাম।

প্যাকেট্‌টা হাতে দিয়ে পানওয়ালী ধীরে ধীরে বল্‌লে,—"আজ আবার সাহেব সেজেছিলেন যে?"

"একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম, তাই।"

"ওতে বড় কাটখোট্টা মতন দেখায়। তা'র চেয়ে দেশী পোষাকে আপনাকে বড় সুন্দর মানায়।"

আমার সাহস এবং ফুর্ত্তি দুই তখন বেড়ে গেছে। বল্‌লাম,—"তাই বুঝি আমার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে হেসেছিলে?"

একটু হেসে সে বল্‌লে,—"না, তা' নয়।......পান চাই কি?"

"না" বলে চলে আস্‌ছিলাম; ভাব্‌লাম কি সামান্য দু'-এক পয়সার পান,—নিলেই বা! দোকানের পান আমি বড়-একটা খাই না বটে, কিন্তু যখন বল্‌ছে......। ফিরে গিয়ে বল্‌লাম,—"আচ্ছা, দাও দু' পয়সার পান।"

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে খুব যত্ন ক'রে সে পান সাজ্‌তে লাগ্‌ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা'র লজ্জাবনত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার যেন একটা নেশা ধ'রে এল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল। অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই ব'লে বস্‌লাম,—"আমার ওখানে একবার আস্‌বে?"

সে কেবল ঈষৎ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে,—মাথাটা আর একটু ঝুঁকে গেল।

আমার তখন সাহসের মাত্রা চরমে পৌঁছেছে। বল্‌লাম,—"আমার বাসা চেন? কোন ঘরে থাকি জান?—বাইরের দিকে সিঁড়ি আছে ঘরে যা'বার?.........তা' হলে আজই— সন্ধ্যার পর,—আমি ফিরে এলে।"

পানগুলি হাতে তুলে দিয়ে, হাসি-মাখানো একটা ছোট্ট চোখের ইঙ্গিতে সে তা'র শেষ সম্মতি জানালে।

সময় আর কাটে না! বসে-দাঁড়িয়ে, পথে পথে ঘুরে, সন্ধ্যা আর হয় না। ফাল্গুন মাসের বেলা কি এত বড় হয়? আগে জান্‌তাম না! সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, তখন বাসায় ফের্‌বার জন্যে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লাম। এতক্ষনে সনৎ নিশ্চয়ই খুঁজ্‌তে এসে ফিরে গিয়েছে।

বাসায় ফির্‌লাম। পানের দোকানে কিন্তু দেখ্‌লাম পানওয়ালা নিজেই ব'সে আছে। তাই ত! কোথায় গেল সে?—বুকটা দমে গেল। অতি কষ্টে পা-দুটোকে টান্‌তে টান্‌তে উপরে উঠে, ঘরের দরজা খুল্‌লাম। বড় গরম বোধ হ'তে লাগ্‌ল, কোট্‌টা খুলে রেখে জান্‌লার সুমুখে চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লাম। তারপর উঠে আলো জ্বাল্‌তে দেখ্‌লাম মেঝের উপর একখানা চিঠি প'ড়ে আছে। খামখানা তুলে নিয়ে দেখি শোভনার হাতের লেখা!

বুক কেঁপে উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম এ আর খুলে কাজ নেই, প'ড়ে থাক। না হয় ছিঁড়ে ফেলে দি'। কিন্তু শেষে খুল্‌তেই হ'ল। সে লিখেছে,—

"সোমবার

সকাল ৮টা

আপনাকে কি বলে সম্বোধন কর্ব্বো জানি না; কিন্তু এ দুদিন একবারও এলেন না কেন?

মেজদির কোন বুদ্ধি নেই। সেদিন আমাকে শুধু নমস্কার কর্ত্তে বল্লে, পায়ের ধুলো নিতে বল্লে না কেন? তাহলে পা দুটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধন্য হতুম। কিন্তু অমন সুযোগ বৃথা গেল। তার ওপর দুদিন ধরে আপনার দেখা পেলুম না। যদি আজও না আসেন, তাই চিঠি না লিখে আর পাল্লুম না।

একবার আস্‌তে পার্ব্বেন না? দু মিনিটের জন্যে। যখন হোক। বেশী কিছু নয়, শুধু একবার আপনাকে দেখবো। আড়াল থেকে। মুখের দুটো কথা শুন্‌বো। তাও আড়াল থেকে।

একবার আসবেন। একটিবার।

ইতি

শোভনা

পুঃ—পাগলের মত মেলা যা-তা লিখে ফেলেচি। বড় লজ্জা কর্চ্চে। কিন্তু আর গুছিয়ে লেখবার সময় নেই। মেজদি হয়ত এখনি এসে পড়বে। এ চিঠির কথা কারুকে বলবেন না। পড়েই ছিঁড়ে ফেল্‌বেন। কিন্তু আসবেন। একটিবার।"

সত্যি শোভনা! তবে কি এ আমারই ভুল? এতদিন কি তবে এমনি অলক্ষিতে তোমার ঐ অফুরন্ত ভালবাসা অজস্র-ধারে বর্ষণ ক'রে এসেছ? আমি অন্ধ, মূঢ়,—কিছু বুঝ্‌তে পারিনি! চুরি ক'রে ভালবাসা! ভালবাসা কি এতবড়ই অপরাধ?

এখন কি করি?......যাই। এখনি যাচ্ছি, শোভনা,—এখনি! হায়, এই মুহূর্ত্তেই যদি তোমার কাছে গিয়ে পড়্‌তে পার্‌তাম!

পিছনে দরজার কাছে একটা অস্পষ্ট শব্দ হ'ল। ফিরে চেয়ে দেখি,—আমারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে—এক নারী মূর্ত্তি!

"এসেছ? তবে নিজেই এসেছ, শোভনা? এস!"—দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলাম।

"আমার নাম শোভনা নয়, জোছনা"—ব'লে আমার বুকের উপর কে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। যখন চিন্‌লাম এ সেই পানওয়ালী, তখন মনে হ'ল যেন একটা জ্বলন্ত লোহার চাপে আমার ঠোঁট দু'খানা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে!

আতঙ্কে শিহরে উঠে তিন হাত পেছিয়ে গেলাম।

হায়! এই আমার জীবনের প্রথম চুম্বন! যুগ-যুগান্তর ধ'রে লক্ষ লক্ষ কবিতার ছন্দ এবং সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়েও যা'র মহিমা প্রকাশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে,—অমৃতের আস্বাদের সঙ্গে পারিজাতের সুরভি মিশিয়ে, যা'তে স্বর্গ-সুখের প্রথম আভাস এনে দেয়, এই কি সেই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন? এতে যে গরলের তিক্ত আস্বাদ,—আগুনের তীব্র জ্বালা!

শোভনার চিঠিখানা তখনও হাতে ছিল। ভাব্‌লাম তা'র উপযুক্ত উত্তরই দেওয়া হচ্ছে বটে!

শোভনা, দেখে যাও,—তোমার ঐ অসীম ভালবাসার কি অপূর্ব্ব প্রতিদান! কৃপণের মতন যে ভালবাসা এতদিন জগতের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে, সেই অমূল্য রত্ন পাওয়ামাত্রেই তা'র কেমন সদ্ব্যবহার হচ্ছে,—একবার দেখে যাও!

অতি কষ্টে নিজেকে কতকটা সাম্‌লে নিয়ে, কর্কশ চাপা গলায় ব'লে উঠ্‌লাম,—"তুমি—তুমি—এখন যাও। আমাকে এখনি বাইরে যেতে হ'বে। ভয়ানক দরকার!"

কোট্‌টাতে হাত গলিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আস্‌বার উপক্রম কর্‌তে, সেও স'রে গিয়ে দরজার কাছে থম্‌কে দাঁড়া'ল। বল্‌লাম—"তুমি আগে যাও,—একসঙ্গে যাওয়া হ'বে না।"

সে একটু ইতস্ততঃ ক'রে ধীরে ধীরে দরজা ছেড়ে বারান্দায় নেমে দাঁড়া'ল। বল্‌লে,—"আচ্ছা, যাই।" তারপর জোর ক'রে মুখে একটু হাসি টেনে এনে বল্‌লে—"তা'হলে, আজ আমাকে কিছু দেবেন? না, আর একদিন?"

তা'র হাসিতে, কথাতে যেন সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে দিলে। হাঁপা'তে হাঁপা'তে বল্‌লাম,—"না না, এখনি দিচ্ছি,—নিয়ে যাও।"

পকেটে গোটা তিন-চার টাকা আর কিছু খুচরা ছিল, মুঠো করে তুলে দিলাম; আঁচল পেতে নিয়ে সে নিঃশব্দে চলে গেল।

হায় নারী, এ কি মূর্ত্তিতে আজ দেখা দিলে তুমি! নারীর রূপ, নারীর নারীত্ব, তা'র স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,—আত্ম-বিসর্জ্জন যা'র নামান্তর মাত্র,—এই অতুল সম্পদ্ এত হীন মূল্যে বিক্রয় কর্‌তে এসেছিলে!

আমার আর বাইরে যাওয়া হ'ল না ; বড় গা ঘিন্ ঘিন্ কর্‌ছিল, স্নান ক'রে এলাম। মুখে সাবান মেখে, ঠোঁট দু'খানা বেশ ক'রে রগ্‌ড়ে বার বার ক'রে ধুয়ে ফেল্‌লাম। কিন্তু জ্বালা কিছুতেই গেল না।

মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল শরীর আসন্ন হয়ে এল, আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। কতক্ষণ পরে ছট্‌ফট্ ক'রে, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না,—শেষরাত্রে খুব শীত ক'রে জ্বর এল।

পাপের শাস্তি সঙ্গে-সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল। কিন্তু এই মোটে আরম্ভ, এখনও অনেক বাকী।

৭

যে ক'দিন অসুখ হয়ে পড়েছিলাম, খবর পেয়ে সনৎ রোজ দেখ্‌তে আস্‌ত। মাঝে মাঝে অপর্ণাও আস্‌তেন, কত সেবা কর্‌তেন, শোভনার কথা বল্‌তেন। শুনে আমার চোখে জল আস্‌ত, কিছু বল্‌তে পার্‌তাম না। অপর্ণা বোধ হয় সেটাকে ভালবাসার চিহ্ন মনে ক'রে কত রকমে সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন।

সেরে উঠ্‌তেই বিবাহের কথা আবার নতুন করে উঠ্‌ল। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। নিজের উপর দারুণ ক্রোধ এবং ঘৃণা হ'তে লাগ্‌ল। আমার পাপের শাস্তি আমাকে ত মাথা পেতে নিতেই হবে ; কিন্তু এই নিরপরাধিনী বালিকাকেও ভুগ্‌তে হ'বে, এ চিন্তা বুকের মধ্যে শেলের মতন বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। অথচ তা'র কোন প্রতিকার খুঁজে পাই না। সে যেমন নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে দিয়েছে, আর কি ফিরিয়ে নিতে পারবে ? তা'ও সম্ভব ব'লে মনে হ'ল না।

তবু, বিবাহে আপত্তি জানালাম,—আমি অতি অধম ; নির্ম্মল পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি শোভনা,—আমি তা'র সম্পূর্ণ অযোগ্য। এ ছাড়া আর কোন কারণ প্রকাশ না হওয়ায়, আমার আপত্তি গ্রাহ্য হ'ল না। পাজি থেকে শুভদিন খুঁজে বা'র করা হ'ল।

শুভদিন! অনন্ত আকাশে বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, যা'রা লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—তা'দের গতিবিধি, যোগাযোগ দে'খে মানুষের শুভাশুভ গণনা! রক্তমাংসের ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে যা'রা এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চলে-ফিরে বেড়ায়, ছোট-ছোট সুখ-দুঃখে যা'দের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,—তা'দের জীবনের গতি, তা'দের প্রাণের যোগাযোগ দে'খে তা'দের শুভাশুভ নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা কি কোন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নেই? তা' যদি হ'ত তা' হ'লে এ বিবাহের জন্যে কোন শুভদিনই খুঁজে পাওয়া যেত না!

কিন্তু বিবাহ হয়ে গেল।

আমাকে পেয়ে শোভনা যে বিলক্ষণ সুখী হয়েছে, তা' বেশ সহজেই বুঝ্‌লাম,—বুঝে অনেকটা শান্তি লাভ কর্‌লাম। ভাব্‌লাম, তা'র পূর্ণ পরিতৃপ্ত ভালবাসা আমার হৃদয়ে সংক্রামিত হয়ে, মনের সকল গ্লানি মুছে ফেল্‌বে। এই সম্মিলিত প্রেমের অপ্রতিহত প্রবাহে আমার জীবনের ক্ষুদ্র কলঙ্কটুকু কোথায় ভেসে যা'বে,—আর তা'র কোন চিহ্ন থাক্‌বে না।

কিন্তু তা' হ'ল না। আমার কলঙ্কের স্মৃতি শত চেষ্টাতেও গেল না। বরং সতর্ক প্রহরীর মতন দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ মিলনের পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হয়ে রইল। তা'র কাছে যেন সর্ব্বদাই অপরাধী হয়ে রইলাম, তা'র প্রেমের দান নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লাম না,

উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পার্‌লাম না। যখনই তা'কে একটু আদর-যত্ন কর্‌তে গিয়েছি, একটা কুণ্ঠিত উদাসীনতার ভাব এসে তা'র অবাধ আত্ম-সমর্পণের চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। ঘনীভূত আলিঙ্গনের মধ্যে যখনই তা'র ঠোঁট দুখানি শিহরে উঠে তৃষিত পুষ্পের মতন স্নিগ্ধ বারিধারায় স্নান কর্‌বার জন্যে অগ্রসর হয়েছে, তখনই সেই স্ফীত উদ্যত অধরের ব্যগ্র আহ্বানকে অগ্রাহ্য ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছি। কেবলই মনে পড়েছে,—সেই গরলের তিক্ত আস্বাদ, আগুনের তীব্র জ্বালা !

৮

বিবাহের পর শোভনার মুখখানি পরিপূর্ণ সুখ ও সার্থকতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দেহে যৌবনের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রূপ, লাবণ্য ও স্বাস্থ্যের পরম পরিণতি হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তা'র শরীর শীর্ণ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, সলাজ প্রফুল্ল বদন ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে এল, একটা গাম্ভীর্য্য ও বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌ল। আমি সেগুলাকে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ মনে ক'রে একটা গর্ব্ব এবং আনন্দ অনুভব কর্‌লাম।

কিন্তু সেটা যে আমার ভুল, তা' জানা গেল বিবাহের ঠিক দু'বৎসর পরে,—যখন শোভনার একটি ছেলে হয়ে দশ দিনের দিন মারা গেল, আর সে নিজেও রোগে পড়্‌ল। শরীর তা'র আগে থেকেই খারাপ ছিল; জীবনের এই প্রথম শোকে একেবারে ভেঙ্গে গেল।

আমি তখন কিশোরগঞ্জে নতুন বদলি হয়েছি, কাজের খুব ভীড়, ছুটি পাওয়া দুর্ঘট। মাস দুই পরে এসে দেখি, শোভনাকে আর চেনা যায় না, এমন তা'র অবস্থা !

চিকিৎসা রীতিমতই চল্‌ছিল ; তবু একবার একজন ভাল ডাক্তারকে এনে দেখানো গেল। তিনি দেখে-শুনে বাইরে এসে, দ্বিধা-কুণ্ঠিত স্বরে রোগের নাম সংক্ষেপে বল্‌লেন,—"টি-বি।" চব্বিশ ঘণ্টা জন্ম-মৃত্যু নিয়ে কারবার, তবু তিনি সাহস ক'রে সোজা কথায় বল্‌তে পার্‌লেন না,—যক্ষা!

তখন গ্রীষ্মকাল। সকলের পরামর্শমত শোভনাকে দার্জ্জিলিং নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে কোন উপকার হ'বার আগেই বর্ষা নাম্‌ল। সেখান থেকে ফিরে এসে, দিনকতক কল্‌কাতায় থেকে—পুরী।

পুরীতেও তা'র কোন উপকার ত হ'লই না বরং দিন-দিন অবস্থা খারাপ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। স্থানান্তরে নিয়ে যা'বারও উপায় রইল না! তখন সনৎ এল মাকে নিয়ে। তাঁরা রোগিণীর পরিচর্য্যা কর্‌বার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়্‌লেন। কিন্তু তাঁ'দের বেশী কিছু কর্‌বার অবকাশ দিতাম না, যতক্ষণ পার্‌তাম নিজেই তা'র কাছে থাক্‌তাম।

তা'কে একটু প্রফুল্ল রাখ্‌বার জন্যে, কাছে ব'সে কত গান, কবিতা, গল্প বল্‌তাম, প'ড়ে শোনাতাম। সে অপলক-নয়নে আমার মুখের পানে চেয়ে নীরবে শুনে যেত। মনে পড়্‌ত সেই আগেকার কথা,—লজিক্ বোঝাবার সময় তা'র সেই একাগ্র, তন্ময় দৃষ্টি! হায়, এতদিনের সঞ্চিত ক্রম-বর্দ্ধমান এই অসীম ভালবাসার পরিবর্ত্তে আমি কি দিয়েছি?—নৈরাশ্য, রোগ, শোক,—পরিণামে হয় ত মৃত্যু!

আজকাল রোগে ভুগে যত তা'র মুখটি মলিন হয়ে আস্‌ছে, ততই তা'র চোখদু'টিতে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটে উঠ্‌তে দেখা গেল। সে দৃষ্টিতে গভীর বেদনার সঙ্গে যেন একটা সুখের আবেশ মিশে আছে। তা'র কি কষ্ট, কিসে তা' দূর হয়, মনে কি ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর্‌লে

ম্লান হেসে কেবল বলে—"কিছু না।" চোখ বুজে আসে, শুষ্ক পাণ্ডুর ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কেঁপে উঠে।

সেইদিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে মনে হ'ত, এমন অমৃতের উন্মুক্ত ভাণ্ডার সম্মুখে পেয়েও এতদিন তা'র আস্বাদ নিলাম না! কি মূঢ় আমি! —এতে যে আমার সকল কলঙ্ক মুছে যেত, সকল গ্লানি মিটে যেত। কিন্তু আর বোধ হয় তা' হ'ল না; শোভনা আর আমাকে বেশী কাছে যেতে দেয় না,—তা'র বিষাক্ত নিশ্বাস থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

একদিন সে অনেকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে, কি ভেবে, নিজেই ডেকে কাছে বসালে। আমার হাতের ভিতর একখানি শীর্ণ হাত রেখে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—"দেখ, আমার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা স্বীকার না পেলেও আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু আমি যাই, তা'তে দুঃখ নেই, কেবল তোমার জীবনটাকেও ব্যর্থ ক'রে দিয়ে যা'ব—এই বড় দুঃখ। হয়ত এখনও তুমি সুখী হ'তে পার। তাই বল্‌চি, আমি যা' বলি তা' শুন্‌বে?"

তা'র হাতখানা সজোরে চেপে ধ'রে বল্‌লাম,—"যা' বল্‌বে তা' বুঝেছি,—কিন্তু তা' হয় না। এখন তুমি সেরে উঠ্‌লে তবেই আমি সুখী হ'ব; না হ'লে—"

একটু ক্ষীণ হেসে শোভনা বল্‌লে,—"আমি জোর ক'রে দিব্যি দিয়ে কিছু বল্‌ছি না। শুধু এই বলি,—যদি আর কাউকে পেলে সুখী হও, যদি আর কাউকে সত্যিসত্যিই ভালবাস্‌তে পার, তা'হ'লে বৃথা আমার কথা ভেবে—"

তা'র কথায় বাধা দিয়ে, আবেগ-ভরে বল্‌লাম,—"তোমাকে কি ভালবাসি না, শোভনা? তোমার কি তা'ই বিশ্বাস?"

শোভনার মুখের উপর আবার তেমনি ঈষৎ হাসির হিল্লোল বয়ে গেল, ঠোঁট দু'খানি তেমনি কেঁপে উঠ্‌ল,—আমার মুখখানা আপনা হ'তেই অত্যন্ত ঝুঁকে পড়্‌ল। অসহায়ের ক্ষীণ হাসি হেসে বল্‌লে,—"না না, আর হয় না। জান না, কতবার সাবধান ক'রে দিয়েছি,—আমার মুখে রোগের বীজ ছড়িয়ে আছে?"

"তুমি জান না, তা'র চাইতে ভীষণ বীজের আকর আমি! হয়ত ঐ বিষেই আমার বিষক্ষয় হ'বে!"

আর সে বাধা দিলে না, চোখ দু'টি তা'র বুজে এল, বাঁ-হাতখানি আমার কাঁধের উপর তুলে দিয়ে, ধীরে ধীরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে।

এই ত প্রণয়ের প্রথম চুম্বন! এতদিন তা' জানিনি, কিন্তু আজ সারা দেহ কি এক অপূর্ব্ব পুলক-প্রবাহে অবসন্ন হয়ে এল,—গরলের তিক্ত আস্বাদ, আগুনের তীব্র জ্বালা—কোথায় সে সব আজ! এতদিনের পুরাতন অভিশপ্ত জীবনের অবসানে নূতন জীবন-সঞ্চারের আবেশে বিভোর হয়ে গেলাম!

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। তা'র শ্লথ বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে উঠে, দেখি শোভনা তখনো তেমনি চোখ বুজে আছে, মুখে সেই ম্লান-মধুর হাসি ছড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তা'র হাত ধ'রে ডাক্‌লাম,—"একবার চেয়ে দেখ শোভনা—কি ছিলাম কি হয়েচি। আজ সঞ্জীবনী-সুধা পান ক'রে নবীন জীবন পেয়েছি। জীবনের ভ্রম ভেঙেছে,—এস এইবার সব ভুলে গিয়ে, প্রেমের নূতন খেলাঘর পেতে, আবার নূতন ক'রে প্রেমের খেলা আরম্ভ করি!"

কিন্তু এ কি! সে যে কোন সাড়া দেয় না; চোখ চায় না,—হাতখানা ঠাণ্ডা বরফ!—হায়, অভাগিনীর জীবনের প্রথম প্রণয়-চুম্বনই তা'র শেষ—প্রাণে-প্রাণে মিলনের এই প্রথম সূচনাতেই তা'র অবসান!

আর্ত্তনাদ করে তা'র শীতল নিস্পন্দ বুকের উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌লাম।

* * * *

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তা'কে একাকিনী কোথায় কোন অচেনা পথে পাঠিয়ে দিয়ে সকলে তখন ঘরে ফিরে এসেছে!

এই হ'ল আমার কথা।

এখন তোমরা বিচার ক'রে বল,······না না, তোমরা কি বিচার করবে,—আমার প্রাণের কথা আমার চেয়ে কে বেশী বুঝ্‌বে? জগতের লোক যদি আমাকে না বোঝে কি ভুল বোঝে,—তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু যার বোঝ্‌বার, বিচার কর্‌বার অধিকার ছিল,—তা'কেই যে আমার গোপন কথা, আমার কলঙ্ক-কাহিনী শোনানো হ'ল না। সব কথা শুনে, সে আমাকে ক্ষমা করে কি না, জানা হ'ল না। আমার ভাল-বাসায় তা'র বিশ্বাস হ'য়েছে কি না, তা'র ভালবাসার একটুও প্রতিদান পেয়েছে কি না, তাও জানা হ'ল না। তা'র যে শেষ মূর্ত্তি দেখ্‌লাম তা' থেকে ত কিছু বুঝ্‌লাম না। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে তা'র মুখে যে হাসি-টুকু ফুটে উঠেছিল তা'রই বা অর্থ কি?

এই সব কথার উত্তর কে দেবে? তোমরা ত তা' পার্‌বে না। বরং যদি পার ত বল,—কত দিন পরে এর উত্তর মিল্‌বে, কতদিনে এই দীর্ঘ বিরহের রজনী প্রভাত হ'বে!

তা'ও বল্‌তে পার না। কিন্তু আমি বল্‌তে পারি। সেই যে সঞ্জীবনী-সুধা পান ক'রে নবীন জীবন লাভ করেছিলাম, তা'র সঙ্গে আরও পেয়েছিলাম—মৃত্যুর বীজ! এই অমৃত-গরলের সম্মিলিত ক্রিয়া আমার দেহে-প্রাণে বেশ দেখা দিয়েছে, পলে পলে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল্‌ছে, সেই পথে—ও-পারের সেই সুন্দরতর জগতের দিকে,—যেখানে মিলনের প্রথম চুম্বনে প্রাণে প্রাণে মিশে এক হয়ে যায়, দুয়ের পৃথক সত্তা লোপ পেয়ে যায়,—সৃষ্টি ধ্বংস হ'লেও সে মিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কা আর থাকে না!

এ-পারের অসমাপ্ত প্রথম চুম্বন যবে ও-পারে গিয়ে পূর্ণ পরিণতি এবং সার্থকতা লাভ করবে,—সেদিনের আর বেশী দেরি নাই!

"বিচিত্রা"—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

দুই বন্ধু

১

স্থান—কলিকাতা, গোলদীঘির উত্তর ধার ; কাল—কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি , অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা।

একটি ভদ্রলোক—গায়ে আলোয়ান, পায়ে গরম মোজা, গলায় গলাবন্ধ—একাকী একখানি বেঞ্চে বসিয়া আছেন।

ভদ্রলোকটির নাম হরকালী গাঙ্গুলী, বয়স ৭২ বৎসর, একহারা, খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ পুরুষ,—গ্রাম্য উপমায় 'পাকা' আমটি'। বৌবাজারে তাঁহার পৈতৃক বাটী ; তাহার এক অংশ ভাড়া দিয়া অপর অংশে নিজেরা বাস করেন। কোন একটা বড় সদাগরী অফিসে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল চাকরি করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। অফিসটি খুব ভাল। তাই তাঁহার জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা পেন্সন বরাদ্দ হইয়াছে, তাঁহার দুই পুত্রেরও সেখানে চাকরি হইয়াছে। নাতিদেরও যাহাতে ঐখানেই অন্নজলের ব্যবস্থা হয় এই শুভ-কামনায় তাহাদিগকে প্রায়ই উপদেশ দিয়া থাকেন— "আর কিছু না হয় হাতের লেখাটা—"

হরকালীবাবু খাঁটি কলিকাতার বাসিন্দা। জন্মাবধি তাঁহার কলিকাতায় বাস। কলিকাতার বাহিরে তাঁহাদের যে কোন আত্মীয়-কুটুম্ব নাই, এটা যেন তাঁহার একটা গর্ব্বের বিষয়। কলিকাতার ভিতরেও, বৌবাজার এবং লালদীঘি (অধুনা তাহার পরিবর্ত্তে গোলদীঘি), ছাড়া অন্য কোন অংশের সহিত তাঁহার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। কলিকাতার বাহিরে জীবনের তাঁহার একবার মাত্র যাইবার সুযোগ ঘটিয়েছিল, বড় নাতিটির স্বাস্থ্যোন্নতির

জন্য—মধুপুর। সুতরাং "আমরা যখন পশ্চিমে ছিলাম" বলিয়া তিনি কোন বর্ণনার অবতারণা করিলে, বুঝিতে হইবে—'পশ্চিম' অর্থে মধুপুর।

হরকালীবাবু বসিয়া বসিয়া অবাল-বৃদ্ধ বায়ুসেবী-কুলের বিচিত্র স্রোত দর্শন করিতেছিলেন। তাহার মধ্যে একজনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হইল। লোকটি তাঁহারই মত প্রাচীন, কিন্তু তাঁহার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, দীর্ঘ-শ্মশ্রুজালমণ্ডিত তেজঃ-ব্যঞ্জক মুখশ্রী এবং দৃঢ় পদক্ষেপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। ইঁহাকে আরও কয়েকবার গোলদীঘিতে বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তেমন লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আজ মনে হইল যেন পূর্ব্বে ভদ্রলোকটির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন চিনিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ ভাবিয়াও কিছু স্মরণ হইল না। তখন আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া, হরকালী-বাবু এই অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে চলিলেন।

ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছেন। হরকালীবাবু একেবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"মশায়কে একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না।"

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন। "আপনার নামটি কি জান্‌তে পারি? আপনাকে যেন চিনি-চিনি কর্‌ছি, অথচ মনে কর্‌তে পার্‌ছি না কোথায় যেন দেখেছি।"

ভদ্রলোকটি তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"কই, আমারও ত মনে পড়্‌ছে না। আমরা কিন্তু কল্‌কাতায় অল্পদিনই এসেছি,—বরাবর পশ্চিমেই থাকা হয়েছে। আচ্ছা, আপনি পশ্চিমে কোথাও গিয়েছেন কি?"

হরকালী দ্বিধাশূন্য চিত্তে উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, পশ্চিমে গিয়েছি বই কি,—মধুপুরে।"

"মধুপুর? মধুপুরে আমরা কখনও যাইনি। রাওলপিণ্ডি, বুলন্দ্ শহর, মীরাট,—এই সব জায়গায় ছিলাম; তা'র মধ্যে রাওলপিণ্ডিতেই অনেকদিন কেটেছে।"

"রাওলপিণ্ডি? সে মধুপুর থেকে কতদূর?"

"আরে ম'শায়, কি বলেন তা'র ঠিক নেই। কোথায় আপনার মধুপুর, আর কোথায় রাওলপিণ্ডি। মধুপুর এখান থেকে হদ্দ দু'শো মাইল—তাও সন্দেহ: আর রাওলপিণ্ডি হোল গিয়ে আপনার এক হাজার তিনশো উন-আসি মাইল!"

রাওলপিণ্ডির দূরত্বের পরিমাণ শুনিয়া, এবং মধুপুর হইতে সেটা যে কতগুণ বেশী, মোটামুটি তাহার মামসাঙ্ক কষিয়া হরকালীবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

ভদ্রলোকটি তাঁহার অবস্থা বুঝিলেন। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "অত দূরে যেতে হ'বে কেন,—আপনার নিবাস কোথায় বলুন দেখি।"

"আমাদের ম'শায়, এই চার পুরুষ কল্‌কাতায় বাস,—বৌবাজার, বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন।"

"ছেলেবেলায় আমিও ত বৌবাজারে ছিলাম—হলধর বর্দ্ধনের লেন··· আচ্ছা দাঁড়ান্, আপনি কোন স্কুলে পড়্‌তেন বলুন ত।"

"বৌবাজার ঈষ্টার্ণ্ একাডেমি।"

"হুঁ, কুলদা বাবু হেড্-মাষ্টার ছিলেন ত—আর হেড্ পণ্ডিত বগলা-প্রসন্ন?—তা' হ'লেই হয়েছে—আপনার নাম?"

"শ্রীহরকালী গাঙ্গুলী।"

ভদ্রলোকটি প্রবল আগ্রহে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আরে তাই কও! হরকালী,—ডিক্রুজ মাষ্টার বল্‌ত হ্যারাকেলী। আর গাঙ্গুলী প্রাণান্তেও বল্‌বে না। বলে, বামুন হ'ল মুখার্জ্জি, ব্যানার্জ্জি, চ্যাটার্জ্জি,—গ্যাংগিউলি হ'তেই পারে না। যদি বামুন হও ত নিশ্চয়ই গ্যাঙ্গার্জ্জি,—তোমরা ঠিক জান না। সেই হরকালী ত? আমি সদানন্দ—সদানন্দ পাল। চিন্‌তে পারছনা? এক ক্লাসেই পড়েছি যে ম্যান্‌!—ভুলে যাচ্ছ? দু'জনে সেই একসঙ্গে টেষ্টে ফেল হয়ে..."

"আর বল্‌তে হ'বে না—মনে পড়েছে। টেষ্টে ফেল হয়ে তুমি ত সেই কোথায় উধাও হয়ে গেলে? তোমার কাকারা কত খোঁজাখুঁজি কর্‌লেন, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিলেন—কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। ...তা'রপর, এই বুঝি ফেরা হল? তা কি হচ্ছিল এতকাল?"

"ওঃ সে অনেক কথা! তা এখানে দাঁড়িয়ে এ ভিড়ের ধাক্কা খেয়ে কি হ'বে,—চল এক জয়গায় বসা যা'ক।"

২

সদানন্দ বলিলেন—"তা'রপর, উঃ কতদিন পরে দেখা বল দেখি?—চল্লিশ বছর বে-ওজর হ'বে।

"চল্লিশ কিহে! বেশী হ'বে। এই ধর না—টেষ্টে ফেল হওয়া গেল, সেটা কোন বছর?—আঠারো শ'..."

"যাক গে', অত সূক্ষ্ম হিসাবের দরকার নেই। এখন এতদিন তোমার কি রকম কাটল বল।"

"কাট্‌ল অম্‌নি এক রকম। টেষ্টে ফেল হ'তেই বাবা তাঁর অফিসে চাকরি ক'রে দিলেন, মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বছর-বছর জমা বাড়্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু আর এক 'মায়ের অনুগ্রহ' হয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি খরচ হয়ে গেল। উপস্থিত দুই ছেলে দুই মেয়ে, তাদের বিয়ে-থা হ'য়ে গিয়েছে, ছেলেপুলেও হ'য়েছে। আমিও রিটায়ার হয়েছি,—এখন বাকী ক'টা দিন···। সে যা'ক্‌, এখন তোমার নিজের কথা বল শুনি।"

"আমি ত সেই এখান থেকে 'প-য়ে আ-কার' দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে একটা গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। টিকিটও করিনি, কোথায় যা'ব তা'রও ঠিক নেই—গাড়ী যতদূর যায়। গাড়ীও জুটেছিল আমারই মতন,—একেবারে টুণ্ড্‌লা জংশন! সেখান থেকে শিকোহাবাদ, ফরক্কাবাদ, সাজাহানপুর, বেরিলী—এই রকম কত জায়গায় ঘোরা গেল, কত রকম কাজ করা গেল। কখনও কুলি-সর্দ্দার, কখনও কেরাণী, দোভাষী, কন্‌ট্রাক্টর,—এমন কি সেপাই হয়ে লড়াই পর্য্যন্ত করেছি। শেষে রাওলপিণ্ডিতে গিয়ে স্থিতি হ'ল। অত দূর দেশেও প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থেকে নিস্তার নেই। কোথা থেকে এক বাঙ্গালী স্বজাতির মেয়ে জুটে গেল—বিয়ে হ'ল। কিন্তু সে বেশীদিন সইল না,—একটি ছেলে রেখে তিনি মারা গেলেন। তা'র পর আর বিয়ে করিনি,—দরকারও হয়নি।"

সদানন্দ একটু বক্র হাসিলেন। কিন্তু হরকালী তাহা লক্ষ্য করিলেন না; তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৃহিনীর ঐকান্তিক সেবা এবং যত্ন তাঁহার বাঁচিয়া থাকার পক্ষে যে কতদূর অপরিহার্য্য তাহা স্মরণ করিয়া, বন্ধুবরের এমন দীর্ঘ বিপত্নীক জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনায় হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল।

সদানন্দ বলিয়া চলিলেন—"রাওলপিণ্ডিতে কন্ট্রাক্টরি করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা গিয়েছিল। ছেলেকে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়ে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকরি যোগাড় করে দিই। তারও এই বছর খানেক হ'ল পেন্সন হয়েছে। কিন্তু সেখানে আর গতিক সুবিধা নয়। বাঙ্গালীর যে খাতির ছিল ত:' ত নেই-ই, বরং সকলে ভয় করে, সন্দেহ করে। তাই ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফেরা গেল। এই হ'ল আমার কথা,—সব গুছিয়ে বল্‌তে গেলে একখানা ইংরেজি নবেলের মতন হয়।"

৩

দুই বন্ধুতে প্রায় প্রত্যহই গোলদীঘিতে দেখা হয়। সদানন্দ আসিয়াই দীঘি প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করেন। হরকালী একটু ক্ষীণজীবি মানুষ, বেশী হাঁটিতে কষ্ট হয়, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে। সুতরাং সদানন্দের পাল্লায় পড়িয়া কায়ক্লেশে এক চক্কর দিয়াই ক্লান্ত হইয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া সদানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন।

তারপর গল্প আরম্ভ হয়। উভয়ে আপন আপন জীবনের স্মৃতি বিবৃত করেন, ছাত্র-জীবনের ছোটখাটো কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। প্রথম দিন-কতক এইরূপ তুলনামূলক বর্ণনা এবং আলোচনা চলিল; তাহার পর একটু একটু করিয়া সমালোচনাও আরম্ভ হইল।

সদানন্দ তাঁহার মতামত নির্ভয়ে, জোর গলায় ব্যক্ত করেন। সে কথায় প্রতিবাদ করিলে অমনি 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া তুমুল তর্কের জন্য প্রস্তুত। একে তর্কপ্রিয় বঙ্গ-সন্তান, তায় সেপাই হইয়া সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তর্ক-যুদ্ধে তাহাকে কে আঁটিতে পারে?

হরকালী কিন্তু সাহেবদের অধীনে চাকরি করিয়া তাহাদের কথায় সায় দিতেই শিখিয়াছেন। বাড়ীতেও গৃহিণীর নির্দ্দেশ মত চলিতে হয়। সেজন্য ঘরে-বাইরে কোথাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। তাই তর্ক করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ,—যে যাহা বলে তাহা বিনা প্রতিবাদে ঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়াই বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং দুই বন্ধুতে গল্প করিতে করিতে যখন কোন মতভেদের সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে, তখন হরকালী যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে একটু ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বর তুলিয়া পরক্ষণেই হার স্বীকার করিয়া সদানন্দের কথা মানিয়া ল'ন। আর তাহাতে সদানন্দ ভারি খুশী!

কথা হইতেছিল লড়ায়ে গোরাদের সম্বন্ধে। সদানন্দের মুখে তাহাদের গল্প শুনিতে শুনিতে হরকালী এক সময়ে বলিয়া ফেলিলেন—"কিন্তু ওরা ত সব মুখ্যু, অসভ্য, ছোটলোক ক্লাস!"

সদানন্দ রুখিয়া উঠিলেন—"নিজের দেশে ওরা ধোপা, কি মুচি, কি মুর্দ্দাফরাস—সে খোঁজে তোমার-আমার দরকার কি? এখানে তা'দের কি রকম খাতির-যত্ন সেটা দেখ। যেখানেই গোরা ফৌজ থাকে, দেখ্‌বে তা'দের ছাউনি সহর থেকে তফাতে, বেশ ফাঁকা, খোলা জায়গায়,—রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোন রকম রোগ সেখানে ঘেঁষ্‌তে পায় না, খাবার জিনিষ সকলের সেরা—দর যতই হ'ক না কেন তা'তে আসে-যায় না। আর খাতির?—এ দেশের রাজা-রাজড়াদের চাইতে একটা গোরার খাতির বেশী—বাইরে যাই হ'ক। এই রাওলপিণ্ডিতেই—চন্দনপুরের রাজা মহী-পাল সিং—মস্ত বড় রঈস্—একদিন ঘোড়ায় চ'ড়ে যাচ্ছিলেন, একটা গোরার গায়ে ধুলো উড়ে পড়ে। সে রাজাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আচ্ছা

ক'রে প্রহার দিয়ে ছেড়ে দিলে। মকদ্দমা আদালতে উঠ্‌ল। হাকিম সব কথা শুনে, হেসে বল্‌লেন—'ও কিছু নয়, লোক চিন্‌তে পারেনি। তা' না হ'লে এত বড় লোককে অপমান কর্‌তে পারে? এ মকদ্দমা ফর্‌ ন্থথিং চালিয়ে কি হবে', আপোষে মিটে যা'ক—ফর্‌গিভ্‌ এণ্ড ফর্‌গেট্‌। গোরাটা অমনি শেক্‌-হ্যাণ্ড্‌ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে। রাজা রাহাদুর আর কি করেন—তিনিও হাতটা এগিয়ে দিলেন। তিনি ভাব্‌লেন—গোরাটাকে ক্ষমা কর্‌লাম; গোরা ভাব্‌লে, লোকটাকে এবার ছেড়ে দিলাম। মিটে গেল। এখন বোঝ!"

হরকালী তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিলেন।—"হ্যাঁ, তা ওদের একটা খাতির আলাদা বই কি। হাজার হ'ক, রাজার জাত, আর এত বড় রাজ্যটা ত ওরাই রেখেছে।"

তর্ক উঠিয়াই মিটিয়া গেল।

কিন্তু হরকালীর মনে ক্রমে একটু বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সদানন্দের এতটা আত্মম্ভরিতা তাঁহার আর ভাল লাগিতেছিল না। প্রথমটা পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে সদানন্দের সকল কথায় সায় দিয়া যাইতেন,—পরে একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয় এবং সঙ্কোচের জন্য। কিন্তু এখন সে ভাব যেন একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। আর চাকরি করিতে হয় না, মনিবের ভয় মোটেই নাই। গৃহে গৃহিণীর শাসন-প্রণালী এতদিনের অভ্যাসে—ইংরাজের শাসন-যন্ত্রের মতই—স্বাভাবিক এবং নির্দ্দোষ বলিয়া ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। সুতরাং জীবনে তাঁহার আর ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, কিছুই নাই। এখন এই শেষ বয়সে তাঁহাকে কি সদানন্দের মত গোঁয়ার-গোবিন্দকে ভয় করিয়া চলিতে

হইবে ? কেন ? কিসের জন্য ? বিদ্যার দৌড় তাহারও ত সেই টেঁষ্টে ফেল হওয়া পর্য্যন্ত। বুদ্ধির বহরও যে বেশী তাহার ত কোন প্রমাণ নাই। একটা বড় চাকরি করিলেও না হয় বোঝা যাইত। তবে তাহাকে এমন ভয় করিয়া চলিতে হইবে কেন ?

এমনই পাঁচ রকম ভাবিয়া হরকালী একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন।

৪

একদিন প্রসঙ্গক্রমে পশ্চিমের আব-হাওয়ার কথা উঠিল। সদানন্দ বলিলেন, গ্রীষ্মকালে সেখানে এত গরম যে পাহাড় ফাটিয়া যায়, আবার শীতকালে তেমনই প্রচণ্ড শীত, হাত-পা অসাড় হইয়া আসে।

হরকালী বলিলেন—"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্‌—কোন কিছুরই বাড়া-বাড়ি ভাল নয়। তা'র চাইতে এখানে কেমন,—শীতও বেশী নয়, গরমও বেশী নয়।"

"তা' হ'লেও, গরমের সময় কষ্টটা কি বড় কম হয় ? ঘামের চোটে অস্থির,—যেন রসগোল্লার রস অনবরতই চোয়াচ্ছে। আর তা'রপর ঘামাচি !—আমাদের পশ্চিমে ওসব উৎপাত নেই।"

"ঘাম হয়, তা'র উপর হাওয়া লাগ্‌লেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সেখানে পাহাড়-ফাটা রোদের ঝাঁজে বড় আরাম হয়, নয় ?"

"আরাম না হ'ক, শরীর কি রকম ভাল থাকে, হজম হয় কেমন ! রোজ রাত্রে দিস্তেখানেক রুটি আর এক বাটি মাংস,—বারো মাস, ত্রিশ দিন, কে জানে শীত, কে জানে গ্রীষ্ম। কিন্তু কখনও হজমের ত্রুটি হয়নি।

এখানে এসে সে অভ্যাসটা কমা'তে হয়েছে, এখন হপ্তায় দু'দিন মাংস খাই। এক :ত এখানকার মাংস ভাল নয়, তায় দর বেশী; তাছাড়া এখানকার রেওয়াজ তেমন নয়, আর হজমও বোধ হয় তেমন হয় না।

হরকালী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—"সে কি! তুমি এখনও অত মাংস খাও? আমি ও সব অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি—দাঁত পড়্‌তে আরম্ভ থেকে। এখন রাত্রে গোনা চারখানা রুটি খাই—দুধে ভিজিয়ে। তা'র বেশী হজম হয় না।"

"দেখ্‌লে ত, ঐ হ'ল জল-হাওয়ার গুণ! আর আমি দেখ, তোমার চেয়ে দু'বছরের বড় ত…"

"হ্যাঁ; মেলা গিল্‌তে পারলেই বড় ভাল!"

"আরে, জীবনের একটা প্রধান সুখই হচ্ছে খাওয়া। তা'ই যদি গেল, ত সাবু-বার্লি খেয়ে শুধু বুকের ভিতর প্রাণটুকু ধুকধুক কর্‌লেই বুঝি বাঁচা সার্থক হ'ল!"

হরকালীর রাগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছিল, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"তা' নয় ত কি? মানব-জীবন কত পুণ্যের জোরে তবে হয়!"

সদানন্দ একটু তীব্র হাস্য করিয়া কহিলেন—"হরকালী, তোমার দেখ্‌ছি সত্যিই বাহাত্তুরে ধরেছে,—কি বক্‌ছ তা'র ঠিক নেই!"

"হ্যাঁ; আর তোমার যে আরো দু'বছর—চুয়াত্তর!"

"তা'র মানে বাহাত্তুরে দশা কাটিয়ে উঠেছি।"

হরকালী আর কোন উত্তর করিলেন না। সদানন্দের দিকে পিছন

ফিরিয়া বসিয়া পকেট হইতে এক ফর্দ্দ পুরাতন খবরের কাগজ বাহির করিয়া—চশমা না পরিয়াই—একমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সদানন্দও ঘুরিয়া বসিলেন এবং সুর করিয়া 'শটকে' পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—"সাতের পিঠে দুই বাহাত্তর, সাতের পিঠে দুই......" তাহার পর উঠিয়া দীঘি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

পরদিন সকাল হইতে দু'জনেই ভাবিতে লাগিলেন,—আজ আর গোলদীঘি যাইয়া কাজ নাই, ঝগড়া-খেচাখেচি করিয়া না-হক্ মন খারাপ করা বই ত নয়!

কিন্তু বেড়াইতে যাইবার সময় যখন আসিল, তখন দু'জনে—কি জানি কেমন করিয়া—সেই গোলদীঘিতেই আসিয়া পড়িলেন। উভয়ে মনে ভাবিয়াছিলেন—সে বোধ হয় আজ আর আসিবে না। কিন্তু হরকালী আসিয়া দেখিলেন সদানন্দ আসিয়া বসিয়া আছেন। তিনি পাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সদানন্দ হাঁক দিলেন—"হরকালী, এই যে, এখানে।"

দুই বন্ধুতে আবার মিলিত হইলেন।

৫

আর এক দিনের কথা।

হরকালী বলিলেন—"আজ একটু সকাল ক'রে ফিরতে হ'বে, শরীরটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। আফিমের মাত্রাটা আজ একটু চড়া'তে হ'বে দেখ্ছি।"

"হরকালী, তুমি আফিম খাও!"

"হুঁঃ, বলে আফিম খেয়েই এতদিন বেঁচে আছি!"

"বল কি! লোকে আফিম খেয়ে মরে তাই ত শুনেছি। তুমি আবার—"

"না হে, জানো না,—আফিমের ভারি গুণ। শরীরে কোনও রোগ সহজে ঢুক্‌তে দেয় না। বিশেষ ক'রে এ বয়সে। তুমিও একটু ক'রে আফিম ধর—বুঝেছ সদানন্দ—উপকার হ'বে।"

"হাঃ! আমি অমন বিষ খেয়ে শরীরটাকে জরিয়ে রাখ্‌তে চাই না। একটু-আধটু অসুখ-বিসুখ আমারও যে করে না তা'ত নয়, তবে সে এক রকম ভাল,—শরীরের বিষ কেটে যায়। আর আমারও একটা ও-রকম ওষুধ আছে,—একেবারে ওষুধের রাজা।" তাহার পরের কথাগুলা মুখে আর না বলিয়া, হাত দু'টি নাড়িয়া ডান হাতটি মুখে তুলিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

হরকালী শিহরিয়া উঠিয়া একটু সরিয়া বসিলেন। বলিলেন—"তুমি মদ খাও না কি, সদানন্দ? এঃ, বড় লজ্জার কথা, ছিছি! আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইব না, যাও!"

"আমিও তোমার সঙ্গে কথা কইব না, যাও! হরকালী না হাড়-কালী,—আফিম খেয়ে খেয়ে হাড় ক'খানা কালি হয়ে গিয়েছে, শুধু বাইরে দেখ্‌তে টুক্‌টুকে,—মাকাল ফলের মতন।"

"সদানন্দ না মদানন্দ! এবার থেকে আমি মদানন্দ বলে ডাক্‌ব। মদখোর পাঁড় মাতাল কোথাকার!"

সদানন্দ কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আমি মাতাল। মাতালরা গুলিখোর অফিমখোর দেখ্‌লেই কামড়ায়, জান ত? আমি তোমায় কামড়াবো!"

হরকালী লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—“পাহারা-ওয়ালা, এ পাহারা-ওয়ালা ! এ লোকটা পাগ্‌লা হোয় গিয়া, হাম্‌কো কাম্‌ড়ানে মাংতা,—জল্‌দি আও, জল্‌দি আও !”

বিকট মুখ-ব্যাদন করিয়া সদানন্দ তাড়া দিয়া আসিলেন। হর-কালী প্রাণপণ ছুটিয়া পলাইলেন,—একবার ফিরিয়া চাহিতেও সাহস হইল না।

এই রকম করিয়া দুই বন্ধুতে কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িতেও পারেন না, অথচ দেখা হইলেই একটা খুঁটিনাটি লইয়া ছেলেমানুষের মত কলহ করিতেও ছাড়েন না। এখন যেন তাঁহারা পরস্পরের দোষ ধরিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আসল কথা, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবকাশ পাইয়া আজ উভয়েরই সকল আশা এবং আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে; এখন এই ঘনায়িত জীবন-সায়াহ্নে তাঁহারা একটিমাত্র কামনাকে প্রচণ্ড আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন,—এই সূর্য্যকরোজ্জ্বল হাস্যময়ী ধরণীর স্নেহময় ক্রোড়ে আরও কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাওয়া। তাই ধরিত্রীর এই প্রাচীন শিশু দু'টির মধ্যে মায়ের কোল লইয়া মহা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে—কেহ যেন অপরকে দখল ছাড়িয়া দিয়া বিদায় হইতে চাহেন না। তাই উভয়ের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটা প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছে, এবং তাহারই ফলে এমন একটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, যাহা হয়ত তাঁহারা নিজেরাও বুঝিতে পারেন না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দু'জনে এতদিন যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, এইবার যেন তাহাতে উভয়েরই আস্থা ক্রমে কমিতে লাগিল। ‘হয় ত আমারই

ভুল, অমুক যাহা করিতেছে হয় ত তাহাই ঠিক'—এইরূপ একটা সংশয় আসিয়া দেখা দিল।

সদানন্দ ভাবিলেন—"তাই ত, আফিমের কথাটা অনেকেই বল্‌ছে বটে, আর বাস্তবিক হরকালী ত এক রকম আফিমের জোরেই টি'কে আছে, নইলে শরীর যা!·· ···আফিমটা ধ'রে দেখা যা'বে নাকি?"

চার আনার আফিম কিনিয়া পরদিন হইতে সদানন্দ একটু করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল;—একটা নিশ্চেষ্ট অবসাদের ভাব আসিয়া পড়িল, কিছু ভাল লাগে না, মেজাজ খিট্‌খিটে। "দূর কর ছাই!"—বলিয়া নূতন কৌটা সমেত আফিমটুকু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সদানন্দ আলমারি হইতে বোতল-গেলাস বাহির করিয়া বসিলেন।

হরকালী ভাবিলেন—"মদটা একটু-আধটু ওষুধের মতন খেলে উপকার হয় বটে,—কিন্তু না, এবয়সে আর ও ধ'রে কাজ সেই—নিজের কাছেই লজ্জা বোধ করে। তবে হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়ার কথা সদানন্দ যা' বলে বড় মিছে নয়; সত্যিই ত······"

গৃহিণীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি একদিন রাত্রে একটু মাংস খাইলেন—বেশ টিপিয়া চট্‌কাইয়া; অসময়ের ইলিস, দুখানা ভাজা মাছ চাহিয়া খাইলে,—বড় তৃপ্তি হইল। কিন্তু পরদিন হইতে এমন অসুখ করিল যে তিনদিন গোলদীঘি যাওয়া বন্ধ,—সদানন্দ আসিয়া খবর লইয়া যান।

কিন্তু এ-সব কথা কেহ কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না, গোপন রহিয়া গেল।

৬

একদিন সদানন্দ আসিয়া দেখিলেন হরকালী একটা ছাতা লইয়া আসিয়াছেন। বলিলেন—"কি হে, আজ আবার একটা ছাতা ঘাড়ে কেন ?

"দেখ্‌ছ না, আকাশ যে রকম ক'রে রয়েছে,—আজ জল-ঝড় হ'তে পারে।"

তুমিও যেমন! কোন কালে জল হ'বে কি না হ'বে, সেই ভেবে একটা তাঁবু বয়ে বেড়া'তে হ'বে! গুলিখোর আফিমখোরের ধারাই এই;—জলকে ভারি ভয়।"

"বড় ঠাট্টা করছ সদানন্দ, কিন্তু বৃষ্টি যদি আসে, টের পাবে। তখন ছাতা দেবো না কিন্তু। অগ্রাণ-পোষ মাসের জল সাংঘাতিক,—ভিজেছ কি মরেছ।"

"হ্যাঃ, তোমার মতন অমন বাতাসার শরীর নয় আমার।"

রেখে দাও তোমার বাহাদুরী! অমন আশু মুখুজ্যে যে আশু মুখুজ্যে, অতবড় একটা বিরাট-পুরুষ,—কে ভেবেছিল......"

"আচ্ছা, এই বাজি রাখ্‌ছি হরকালী,—তুমি যদি আগে না মর ত কি বলেছি! তুমি মরবে, তোমার শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়ে, তবে আমি মরব,—এই বলে রাখ্‌লাম, দেখে নিও।"

"কক্‌খনো না! নিজের বয়সটার হিসাবে রাখ? আর তোমার মতন লোক অম্‌নি পট্‌ ক'রেই মরে। তখন দেখা যা'বে, কে কা'র শ্রাদ্ধের ভোজ খায়।"

"এই কথা ত? আচ্ছা বেশ, দেখা যা'বে।"

দু'জনে বার-কতক "আচ্ছা, দেখা যা'বে" বলিয়া গুম্ হইয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। সদানন্দ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হরকালী—ছাতা খুলিয়া বলিলেন—"কি হে, এখন যে পালাচ্ছ বড়!"

"পালা'ব না ত কি কচুপাতা মাথায় দিয়ে ব'সে থাক্‌ব?"—বলিয়াই সদানন্দ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হরকালী তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে হাঁকিলেন,—"সদানন্দ, দাঁড়াও দাঁড়াও,—আমিও যাচ্ছি। এক ছাতাতে দু'জনকারই হ'বে 'খন।"

"দুত্তোর ছাতা!"

সদানন্দ দ্রুত দৌড়াইয়া গিয়া রাস্তার মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন।

হরকালী সেনেট হলের বারাণ্ডায় গিয়া আশ্রয় হইলেন। কিন্তু তাহার ছাদ প্রায় আকাশেরই সমান উঁচু—জল বড় বেশী আট্‌কায় না। ছাতা খুলিবার যো নাই, খুলিয়াও কোন লাভ নাই; কাজেই নিরুপায়,—দাঁড়াইয়া ভিজিতে হইল। তাহার উপর জোর হাওয়া—বেচারীকে কাঁপাইয়া দিল।

তারপর দু'জনেরই নিউমোনিয়া।

বেশীদিন কাহাকেও ভুগিতে হইল না তিনদিনের আড়া-আড়িতে দুই বন্ধুরই ইহলীলা সাঙ্গ হইল।

কেহ কাহারও শ্রাদ্ধের ভোজে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না।

"বিচিত্রা"—বৈশাখ, ১৩৩৯।

মুখের কথা

১

কুসুমপুরের জমিদার রায় মহাশয়দের একান্নবর্ত্তী সংসার যখন একদিনের একটা অসংযত মুখের কথায় ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তিন পুরুষের এজমালি বিষয়-সম্পত্তি বিভাগের জন্য জেলা-আদালতে তুমুল মকদ্দমা চলিতে লাগিল, তখন সারা গ্রামখানিতে এক নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আঘাত লাগিয়াছিল কেবল দু'টি ক্ষুদ্র কোমল প্রাণে। দুই তরফের দুই বংশধর সতীশ এবং জ্যোতিষ—সমবয়সী, মাত্র এক মাসের ছোট বড়,—এবং একসঙ্গে, একই ভাবে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। লোকে বলিত, এক মায়ের পেটেই যমজ-সন্তান হইয়া থাকে, কিন্তু এমনটি কখনও দেখা যায় না। সহসা যখন এই বিবাদের বিরাট প্রাচীর উঠিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের পৃথক করিয়া দিল,—এমন কি, বিদ্যালয়ের একই ক্লাসে রহিয়াও কর্ত্তাদের আদেশে এ উহার পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইল, তখন তাহাদের ক্ষুদ্র বক্ষ দুটী রুদ্ধ শোকের আবেগ আর সহ্য করিতে পারিল না। এই যন্ত্রণা হইতে উভয়েই একটু মুক্তিলাভ করিল, যখন সতীশের পিতা বিপক্ষের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাকে স্কুল হইতে সরাইয়া লইলেন।

তাহার পর এই যে ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে ঘটনা-বাহুল্য না থাকিলেও ঘটনা-বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। সাত বৎসর মকদ্দমা চলিবার পর যখন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, তখন উভয় পক্ষের দুরবস্থারও চূড়ান্ত হইয়াছে। আদালত হইতে আমিন আসিয়া যখন তাঁহাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি দুই সমান অংশে বিভাগ করিয়া গেল, তাহার বহু পূর্ব্বেই ভাগ্য-দেবতার অদৃশ্য মাপকাঠিতে ছোট-বড় দুই শত অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আদালত-নির্দ্দিষ্ট নিজ-নিজ অংশে দখল পাইয়া, এই সাত বৎসরের হিসাব খতাইয়া এবং দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেখিলেন যে, পৈতৃক বাস-ভবনের অংশ ছাড়া যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে সাবেক চাল বজায় রাখা আর চলে না।

কিন্তু নূতন কোন ব্যবস্থা করিবার অবকাশও তাঁহাদের মিলিল না। মকদ্দমা শেষ হইতেই বোধ হয় তাঁহাদের জীবনের কার্য্যও ফুরাইয়াছিল, তাই এক বৎসরের মধ্যে উভয়েই ইহ-লীলা সাঙ্গ করিলেন।

জ্যোতিষকে কলিকাতার কলেজের পড়া অসমাপ্ত রাখিয়া পশ্চিমাঞ্চলে চাকরি করিতে ছুটিতে হইল।

সতীশের মামা হাইকোর্টের উকিল; মকদ্দমার সময় তাঁহার অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে এ-পক্ষের বাজে খরচ অনেক কমিয়াছিল। তাহার উপর সতীশের পিতা খুব হিসাবী লোক ছিলেন, ছেলেকে স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বেশী দিন বসাইয়া রাখেন নাই, বিষয়-কর্ম্ম দেখা-শুনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, হাতে-কলমে বেশ একটু শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই সতীশের পিতৃ-বিয়োগ হইলে তাহাকে জ্যোতিষের

মত অকূলে ভাসিতে হয় নাই, পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতেই সংসার চালাইয়া ক্রমে সে একটু গুছাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

২

এই ত্রিশ বৎসর কাল সতীশ এবং জ্যোতিষ কেহ কাহারও কোন সংবাদ রাখিতেন না। বাল্য-স্মৃতি অবশ্য একেবারে মুছিয়া যাইবার নয়; কিন্তু সে স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনায় পূর্ণ। পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহার যে যাতনা, তাহা কাঁটা তুলিয়া ফেলিলেই দূর হয়; কিন্তু ক্ষতস্থানে এমন একটু বেদনা থাকিয়া যায়, যাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত কাঁটা-ফোটার তীব্র যাতনাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইঁহাদেরও তাহাই হইয়াছিল;—বাল্য-জীবনের পরিপূর্ণ সুখের স্মৃতি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল তাঁহাদের আকস্মিক বিচ্ছেদের বেদনায়। তাই যখনই একজনের কথা আর একজনের মনে পড়িত, তখন সেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের স্মৃতিই জাগিয়া উঠিত,—বাল্যকালের কথা ভাবিতে কাহারও মনে সুখ ছিল না।

এতদিন পরে আজ জ্যোতিষের একখানা পত্র পাইয়া সতীশের হৃদয় সহসা এক অপূর্ব্ব সুখের আবেশে ভরিয়া গেল। বাল্যের সেই বিস্মৃতপ্রায় ভ্রাতৃস্নেহ আজ আবার এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল। জ্যোতিষ চিঠিতে তাঁহাকে "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি আর এমন কুসুমপুরের বড়-তরফের সতীশ রায় নহেন,—জ্যোতিষের দাদা! জ্যোতিষের সেই বাল্যকালের মধুর ডাক যেন বার বার তাঁহার কানের নিকট ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অতীতের যত সুখময় স্মৃতি একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

এই সময়ে কন্যাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সতীশ বলিয়া উঠিলেন—"বীণা, তোর কাকা আস্‌চে যে! এই দেখ, চিঠি দিয়েচে,—আট-দশ দিনের ভিতরই এসে পড়্‌বে।"

বীণা প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। সে 'কাকা' বলিয়া কাহাকেও জানিত না। জ্যোতিষের কথা সে লোকমুখে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু শুনিয়াছে বটে, কিন্তু পিতার মুখে কখনও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। তাই নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া, তাহাতে পত্রলেখকের স্বাক্ষর দেখিয়া তবে কথাটা বুঝিল। বলিল—"ও! ও-বাড়ীর জ্যোতিষ রায়?"

সতীশ বাধা দিয়া বলিলেন,—"জ্যোতিষ রায় কি রে! ও যে কাকা হয়,—দেখ্‌চিস্‌ না, আমাকে দাদা ব'লে চিঠি লিখেচে!"

বীণা যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, একটু নরম স্বরে বলিলেন—"তা তুই বা জান্‌বি কি ক'রে,—কখনও ত চক্ষে দেখিস্‌ নি। কিন্তু তা'র কথা কি কখনও কিছু শুনিস্‌ নি?"

বীণা বলিল—"কিছু কিছু শুনেচি বই কি।"

সতীশ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন,—"তা'কে আমি বড় ভালবাসতুম, জানিস্? মায়ের পেটের ভাইকেও বোধ হয় লোকে এত ভালবাস্‌তে পারে না।"

তার পর সতীশ তাঁহার বাল্যকালের সুখ ও সৌহার্দ্দ্যের কথা,—যাহা এতদিন নিজের কাছ হইতেও লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—একে একে শুনাইতে লাগিলেন। এ আলোচনায় তাঁহার এত আনন্দ দেখিয়া বীণা ভুলিয়া গেল যে সে পিতাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়াছে।

সতীশ বিপত্নীক, বীণা তাঁহার একমাত্র সন্তান। সেও তিন বৎসর হইল পর হইয়া গিয়াছে। এখনও যে একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই, তাহার কারণ জামাতার কর্ম্মস্থল অতি দূরে। এম্‌-এ পাশ করিয়া সে এই এক বৎসর হইল রেঙ্গুন কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছে। কচি-ছেলে লইয়া বীণাকে অত দূরে পাঠাইতে সতীশের সাহস হয় নাই, জামাইও দ্বিরুক্তি করে নাই। বীণাও পিতার নিঃসঙ্গ জীবনকে একটু সরস করিয়া রাখিবার জন্য এই বিচ্ছেদের ক্লেশ হাসিমুখে বহন করিতেছে। তাই আজ পিতার এত আনন্দ দেখিয়া সে বড় সুখী হইল। পিতার কথা শুনিতে শুনিতে সে এতদিনে তাঁহার হৃদয়ের এক সরস কোমল অংশের সন্ধান পাইয়া তৃপ্ত হইল; ভাবিল, বাল্য-সখার সহিত এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলন হইলে হয় ত তাঁহার সুখের অভাব অনেকটা পূর্ণ হইবে।

কিন্তু জ্যোতিষ মাত্র তিন মাসের ছুটি লইয়া আসিতেছেন। তাঁহার বড় মেয়েটি অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে,—যদিও আজকাল এ কথাটা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে,—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। মিলিটারি বিভাগের চাকরি,—অধিক ছুটি পাওয়া গেল না।

৩

জ্যোতিষ আসিলেন। কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিল। কিন্তু সতীশের যতটা স্ফূর্ত্তি দেখা গেল জ্যোতিষের ততটা হইল না,—কন্যার বিবাহের চিন্তায় যেন একটু বিমর্ষ, অন্যমনস্ক। সতীশ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার কোন চিন্তা নাই, সকল ভার আমার উপর ছেড়ে

দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক! আমি কথা দিয়ে রাখ্‌চি, যেমন ক'রে হ'ক তোমার মেয়ের বিয়ে আমি দিয়ে দেবোই।"

দুজনে মিলিয়া পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু কোনটিই অধিক অগ্রসর হইল না। বর মিলে ত ঘর মিলে না, ঘর মিলে ত পাত্র পছন্দ হয় না। যদি দুইই মিলিল ত দর শুনিয়া পিছাইতে হইল।

এইরূপে দুই মাস কাটিল। জ্যোতিষ যেন একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সতীশের উদ্যম বাড়িয়া গেল; জ্যোতিষকে বসাইয়া রাখিয়া তিনি নিজেই ঘুরিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর একটা সুবিধা হইল। সতীশ জামাতার নিকট হইতে পত্র পাইলেন, শীঘ্রই তাহার কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি হইবে, তখন সেও আসিয়া পড়িবে। তিনি জ্যোতিষকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"অমল এলে অনেক সুবিধা হ'বে। তা'র বিস্তর আলাপী ছোকরা আছে, একটা যোগাড় ক'রে দেবে এখন। তা'ছাড়া, বাবাজী আমার ছুটাছুটি ঘেরোঘুরি করতে খুব মজবুৎ।"

৪

জ্যোতিষের মেয়ে উষা দুদিনের মধ্যে বীণার সহিত খুব ভাব জমাইয়া লইয়াছে। দিবারাত্র সে দিদির কাছেই থাকে। দিনের বেলার আহারটা প্রায় নিজের বাড়ীতেই সারিয়া আসে, কিন্তু রাত্রে বীণার সহিত একত্র ভোজন ও শয়ন করে।

বীণার খোকাটিরও সকল ভার এখন প্রায় উষাই লইয়াছে। ছ'-মাসের শিশু এই নূতন লোকটির নিকট মায়ের অপেক্ষা বেশী আদর পাইয়া ক্রমে তাহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজন না বুঝিলে সে মাসীমাকে ছাড়িয়া মায়ের কোলে যাইতে চাহে না।

বীণা উষাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বিবাহ হইলেই ত খোকাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সুতরাং এত মায়া বাড়ানো ঠিক নয়। শুনিয়া উষা লজ্জায় কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু মনের ভিতর একটা বেদনা অনুভব করে। সে বলে—"দেখ দিদি, তোমার যখন আর একটা খোকা হ'বে, তখন এটা আমাকে দিয়ে দিও,—কি বল ?" বীণা বলে—"ততদিনে তোরও দুটো ছেলে হ'বে রে; তখন দিদির ছেলেকে ভুলে যাবি।" উষা বলে,—"বাঃ! তা' হ'বে কেন ?" বীণা বলে—"কেন হ'বে তা' বল্‌তে পারি না, কিন্তু হ'বে তা' জানি।" "বড্ড জানো !" বলিয়া উষা মুখ-চোখ লাল করিয়া দিদিকে ঘুঁসি মারিয়া বা চিম্‌টি কাটিয়া এই তর্কের উপসংহার করিয়া দেয়।

উষা যেদিন শুনিল বীণার স্বামী অমল কাল আসিবে, সেদিন রাত্রের আহার সারিয়া সে নিজের বাড়ীতে শয়ন করিতে চলিল। বীণাকে বলিল—"কাল থেকে ত ভাই তোমার কাছে আর শুতে দেবে না; তা'র চাইতে আগে থেকে মানে-মানেই যাই। একলা শোয়ার অভ্যাসটা আজ থেকেই করি।" বীণা হাসিয়া উত্তর করিল—"সে আর বেশী দিনের জন্যে নয় গো! এই মাসেই—" উষা সলজ্জ ভ্রূকুটি করিয়া তাড়া দিয়া আসিল—"দাঁড়াও ত!" বীণা তাহার আস্ফালন দেখিয়া হাসিয়া পলাইল; উষাও খিড়্‌কি দ্বার দিয়া নিজের বাটীতে চলিয়া গেল।

শিশুকাল হইতে পশ্চিমে থাকিয়া উষার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা একটু স্বতন্ত্র ধরণের হইয়ছিল। অনেক বয়স পর্য্যন্ত সে "দিদি-বাবু" সাজিয়া ভৃত্যের সহিত ভাই-ভগিনীদের লইয়া কোম্পানী-বাগানে বেশ হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়াছে, বালিকা-সুলভ লজ্জা বা ভয়ের ধার ধারিত না। কিন্তু আজকাল কোথা হইতে একটা দুর্জ্জয় সঙ্কোচের ভাব আসিয়া তাহাকে নিতান্ত সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অপরিচিত লোকের সম্মুখে বাহির হইতে সে বড় কুণ্ঠিত হয়। তাই বীণার স্বামী আসিতেছে শুনিয়া প্রথমে তার মনটা একটু দমিয়া গিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইল, দিদির সহিত তাহার যে মধুর অন্তরঙ্গ ভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল, এই অপরিচিত লোকটি আসিয়া তাহাতে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু মায়ের কাছে যখন শুনিল ভগিনীপতির সম্মুখে লজ্জা করিতে নাই, তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে, এমন কি ঠাট্টা-তামাসাও করিতে হয়, বরং না করিলেই দোষ, তখন তাহার প্রাণে এক নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিল। জামাই-বাবুর সহিত কি কি কথা হইবে, কিরূপ তামাসা করিবে, তাহারই কল্পনা করিতে করিতে উৎসুক আগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরের ট্রেণে অমল আসিল। সামান্য বিশ্রাম করিয়া স্নান করিয়া লইল, বীণা চা আনিয়া দিল। তখন একটু বেলা হইয়াছে, বীণাও স্নান করিয়া এলোচুলে খোকাকে কোলে লইয়া অমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে খিড়্‌কিতে উষার গলার সাড়া পাইয়া বীণা তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

উষার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হয় নাই, ভোরবেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাই অমল আসিয়াছে তাহা জানিতে পারে নাই। সে যে সকালে আসিবে তাহাও জানিত না। তাহারা আসিয়াছিল বৈকালে, তাই বোধ হয় ভাবিয়াছিল সকল ট্রেণ বৈকালেই আসে। উঠিতে বেলা হইয়াছে দেখিয়া উষা তাড়াতাড়ি এ-বাটীতে আসিয়া দেখিল, বীণা ছাদে দাঁড়াইয়া খোকার মুখে অজস্র চুম্বন বৃষ্টি করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে।

তাহার এই স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া উষা বলিল—"ও! বড্ড আদর হচ্চে যে! আজ আবার সকাল বেলাই ছান্ করা হয়েচে,—বর আস্‌বে কি না, তাই!" এই বলিয়া বীণার পৃষ্ঠে একটা মৃদু কিল মারিয়া তাহার সারা পুলকাবিষ্ট দেহে আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া দিল। বীণা কোন কথা কহিল না, একটু দুষ্ট হাসিয়া উষার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহাকে পরাজিত বুঝিয়া উষা বিজয়-গর্ব্বে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"রোদে চুল শুকোতে এসেছ, ত কচি ছেলেটাকেও টেনে এনেছ কেন? বাছার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে, দেখ দেখি! দাও, ছেলে আমাকে দাও।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে বীণার কোল হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল।

অমল তখন চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতেছিল; উষাকে ছেলে কোলে করিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহাকে বীণা মনে করিয়া বলিয়া উঠিল—"পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন? কাছে এস না।" পর মুহূর্ত্তে দুজনে চোখোচোখি হইতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

কতকটা বীণারই মত এই অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া, এবং তাহাকে কি কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া, অমল লজ্জায় বিস্ময়ে

নির্ব্বাক হইয়া গেল। আর উষা,—সে ত জানিতই না যে ঘরের ভিতর কেহ আছে। সহসা একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া এবং তাহার এই আহ্বান শুনিয়া, লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, এবং পর মুহূর্ত্তেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বীণার কাছে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"দিদি,ঘরে ও কে?"

বীণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর করিল—"কে তা' কি ক'রে বলি।"

উষা রাগিয়া উঠিল; বলিল—"তোমার ঘরে ব'সে রয়েছে, তুমি জান না কে! আমায় ধর্‌তে এসেছিল!"

উষা কাঁদিয়া ফেলিল। বীণা তখন সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিল—"এও বুঝ্‌তে পার্‌লি না, পাগ্‌লী মেয়ে! ওই ত তোর জামাই-বাবু। চল্ আলাপ-পরিচয় করিয়ে দি। তা তুই অত ভয় পেয়েছিস্ কেন? সত্যিই ধর্‌তে এসেছিল?"

দিদির কথায় উষার ভয় দূর হইল, বুকটা একটু হাল্কা হইল। কিন্তু শেষ প্রশ্নটায় সে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল, অপরাধীর ন্যায় মিনতির স্বরে কহিল—"না দিদি, মিথ্যে ক'রে বলেছিলুম। আমার বড় ভয় পেয়েছিল কি না। জামাই-বাবু এসেচেন তা' ত আমি জানি না। তুমিও ত বলনি সকালে আস্‌বেন,—তোমারই ত দোষ!"

বীণা নীরবে এই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। আজ তাহার প্রাণ এক তীব্র সুখে ভরপুর,—শত অপবাদ, শত লাঞ্ছনাও আজ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

উষাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া বীণা অমলের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিল—"এইটি আমার ছোট বোন্ উষা। এরই বিয়ের জন্যে

কাকাবাবু ছুটি নিয়ে এসেচেন।” খোকাকে তাহার মায়ের কোলে দিয়া ঊষা সলজ্জ চরণে অগ্রসর হইয়া অমলের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা গড় করিল এবং ফিরিয়া গিয়া দিদির পশ্চাতে দাঁড়াইল।

অমল বলিল—“চোখের দেখাটাই বাকী ছিল, আর সব খবরই জানি। তা কর্ত্তারা দু-মাসেও কিছু পার্‌লেন না ত? যাক্, এখন আমি এসে পড়েছি,—এইবার বিয়ের ফুল ফুট্‌ল। এই মাসের মধ্যে যদি না হয় ত..”

বীণা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—“ঢের হয়েচে, নিজের বাহাদুরী আর কর্‌তে হ’বে না। সেই আপনার কথাই ক’ কাহন বলে,—তাই; দেখ না! একটা নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হ’ল, কোথায় তা’র সঙ্গে দুটো কথা কইবে,—তা নয়...”

কথাটা আর শেষ হইল না। অমল হঠাৎ যেরূপ ভালমানুষটির মত,—বোধ হয় কি কথা কহিবে তাহাই খুঁজিবার জন্য,—ঘরের চারিদিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, তাহাতে দুজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বীণা ঊষার গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া একটু নিম্নস্বরে কহিল—“তুই কিছু বল্ না। বল্‌বি বলে কত কথা মুখস্থ ক’রে রেখেছিলি—দু-একটা এই বেলা বল্!” কিন্তু ঊষার মুখে কথা ফুটিল না। যাহাকে বলিবে, তাহার সহিত যে ভাবে পরিচয় হইল, এবং গোড়াতেই যে প্রসঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাহার মুখস্থ বুলি সব গুলাইয়া গেল,—একটাও মনে আসিল না।

৬

এইবার অমলের ঘোরাঘুরির পালা আরম্ভ হইল। সে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না, বিনা কাজে ঘুরিতেও বেশ আমোদ পায়। তাই

বিবাহের পাত্র অন্বেষণের ভার যখন তাহার উপর পড়িল, তখন সে আন্তরিক আগ্রহের সহিতই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে সে কয়েকবার কলিকাতায় ঘুরিয়া আসিয়াছে। সেখানে যত পুরাতন সমপাঠী বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু, তস্য বন্ধু, বিস্তর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। তাহাদের অনেকেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাহাদের হয় নাই, তাহারা যতবড় উপাধিধারীই হউক না কেন, বিবাহ সম্বন্ধে এখনও নাবালক, মাতাপিতার একান্ত আজ্ঞাবর্ত্তী,—নিজেরা কোন কথাতেই নাই। অমল তাহাদের অভিভাবকদেরও ধরিতে ছাড়িল না। কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই,—বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। তথাপি সে হাল ছাড়ে নাই, আজ আবার গিয়াছে,—রাত্রে ফিরিবে।

বৈকালে বীণা ও ঊষা পরস্পরের চুল বাঁধিয়া দিয়া পুকুরে গা ধুইতে গেল। কথায় কথায় অমলের প্রসঙ্গ উঠিল। তাহাকে লইয়া দু'বোনে অনেক আলোচনা করিয়াছে,—তথাপি অনেক কথা এখনও বাকী।

ঊষা বলিল—"আচ্ছা সত্যি করে বল ত দিদি, জামাইবাবুকে খুব ভালবাস নয় ?"

বীণা হাসিয়া বলিল—"কেন বল্ দেখি ?"

ঊষা। কেন আবার কি ? বল না—হাঁ কি না।

বীণা। তা' তুইই বল্‌না কেন !

ঊষা। আমি আবার কি বল্‌ব, বা রে ! তুমি নিজের মুখে বল না।

বীণার মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল; গাঢ়স্বরে বলিল—"তীর্থ করে এসে কেউ কাউকে বলে না, জানিস ? তেম্‌নি ও কথাও যে নিজের মুখে বল্‌বার নয়, বোন ! তোরও যখন হ'বে, তখন বুঝ্‌বি।"

উষার মুখের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার যেন বেশী করিয়া ঘনাইয়া আসিল। বীণা তাহা দেখিল। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"জামাই-বাবুকে তোর কি রকম লেগেচে বল্ দেখি।"

উষার মুখ আবার প্রফুল্ল হইল; সংক্ষেপে বলিল,—"বেশ,—খুব সুন্দর লোক!"

বীণা বলিল—"সুন্দর বল্‌চিস কি চেহারায়, না—?"

উষা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"তা' কেন, সব দিকেই বেশ।—আবার কি রকম আমুদে ভাই!"

অমল কবে কি একটা কৌতুক করিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া উষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

বীণা হাসিয়া বলিল—"তা' হ'লে এক কাজ কর্ না কেন?"

কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া উষা বলিল—"কি?"

একটু দূরে সরিয়া গিয়া, বীণা দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"তোর জামাই-বাবুকেই বিয়ে কর্ না!'

উষার মুখ লাল হইয়া উঠিল; বীণাকে কাছে না পাইয়া জল ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল—"যাঃ! তা বুঝি আবার হয়!"

বীণা বলিল—"খুব হয়,—ভগ্নিপতির সঙ্গে আর বিয়ে হয় না? আচ্ছা, তুই বল্ না,—হয় কি না দেখ্‌বি।"

অভিমানের সুরে উষা বলিল—"হ্যাঁ, আমি বল্‌লেই!—আর তুমি—?"

মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল, বীণা গাঢ় স্বরে উত্তর করিল—"আমি?—আমি তাও পারি। এই জল ছুঁয়ে বল্‌চি বোন্, হিন্দুর

ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মেছি, হাসিমুখে সব সইতে পারি,—কেবল স্বামীর অকল্যাণ ছাড়া।"

বীণার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অপলক নেত্রে শূন্যে কোন অদৃশ্য মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার নয়ন-পল্লব সিক্ত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কাহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

চোখে-মুখে জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া যখন সে চাহিয়া দেখিল, তখন উষাকে দেখিতে পাইল না,—সে কখন নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া উষাকে খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া বীণা দেখিল, উষা মুখটি ভার করিয়া জানালায় বসিয়া আছে। বীণা কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে দেখিয়া উষার মা হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"আজ আবার কি হ'ল উষার ?"

বীণা বলিল—"কিছু নয়, কাকী-মা ; ওর জামাই-বাবুকে ভারি পছন্দ হয়েচে কি না,—তাই বল্‌ছিলাম তা'কেই না হয় বিয়ে কর্‌।"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন—"তুইও আচ্ছা পাগ্‌লী মেয়ে যা' হ'ক মা !"

বীণা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"কেন, অন্যায় এমন কি বলেচি, কাকী-মা ? তা' কি হয় না ?—কথায় বলে 'বোন-সতীন',—একবার না হয় পরীক্ষা ক'রেই দেখা যেত, কি-রকমটা দাঁড়ায়।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"তা, এও যে বড় বিদ্‌কুটে খেয়াল মা ! না রে উষা, তোর দিদি তামাসা ক'রে বলেচে। শালী-ভগ্নিপতিকে নিয়ে অমন কত ঠাট্টা-তামাসা করে, তা'র জন্যে কি রাগ কর্‌তে আছে, বোকা মেয়ে !"

৭

অমল কলিকাতায় একটা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। কর্ত্তারা পরদিন দেনা-পাওনার কথা স্থির করিতে গেলেন। বরকর্ত্তার কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ,—ছয় হাজার টাকা নগদ দিতে হইবে, অলঙ্কার তিনি নিজে পছন্দমত একসময়ে গড়াইয়া লইবেন। জ্যোতিষ কন্যার বিবাহের জন্য দুই চারিখানি গহনা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও গ্রাহ্য হইল না—টাকা সব নগদ চাই। হাজার অনুনয়-বিনয়েও যখন বরকর্ত্তার মন গলিল না, তখন জ্যোতিষ অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে উপরিউক্ত সর্ত্তেই সম্মত হইলেন এবং সতীশকেও রাজী করাইলেন।

জ্যোতিষের কিন্তু এত টাকার যোগাড় ছিল না। এক সপ্তাহ পরে বিবাহের দিন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে টাকা সংগ্রহ হয়, ইহাই এখন বড় ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইল।

সতীশের হাতে নগদ টাকা বেশী থাকিত না; যাহা কিছু ছিল আনিয়া জ্যোতিষের হাতে দিলেন। এইরূপে এ-দিক ও-দিক হইতে যাহা সংগ্রহ হইল তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেড় হাজার টাকার অকুলান রহিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও টাকার কোন কিনারা হইল না। তখন জ্যোতিষকে মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া গ্রাম্য মহাজন এককড়ি নন্দীর শরণাপন্ন হইতে হইল। এককড়ি সহজে টাকা বাহির করিতে চায় না; বলে, গ্রামস্থ জমিদারকে টাকা কর্জ্জ দিবে এতদূর স্পর্দ্ধা তাহার নাই; সে সামান্য তেজারতি করে, এত টাকা কোথায় পাইবে ইত্যাদি। অবশেষে সতীশের বিশেষ অনুরোধে কিছু সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। দলিল

লেখাপড়া সেইদিনই হইয়া গেল, স্থির হইল পরদিন রেজিষ্ট্রী অফিসে যাইয়া টাকার আদান-প্রদান হইবে।

কিন্তু পরদিন এককড়ির আর দেখা নাই। বাড়ীতে খোঁজ লইয়া জানা গেল, কোন এক আত্মীয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া সে ভোরে উঠিয়াই বিষ্ণুপুর চলিয়া গিয়াছে, দুই দিন পরে ফিরিবে। আশায় আশায় এই দুই দিন কাটিল, কিন্তু এককড়ি ফিরিল না বা তাহার কোন সংবাদ আসিল না।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। আর কোন উপায় না দেখিয়া সেদিন সকালেই অমলকে টাকার জন্য কলিকাতায় ছুটিতে হইল। কতক-গুলি অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া গেল, সেগুলি বন্ধক রাখিয়া আবশ্যক মত টাকা যোগাড় করিয়া আনিতে হইবে।

সারাদিন কালকাতার নানা স্থানে ঘুরিয়া অমল দেখিল জিনিষ বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে কেহই রাজী নয়,—বিক্রয় করিতে পারিলে হয়। কিন্তু এগুলি সতীশের পরলোকাগতা পত্নীর অলঙ্কার। তাঁহার এই স্মৃতিচিহ্নগুলি বিক্রয় করিবার কল্পনা পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই, অমলেরও সাহস হইল না। কাজেই টাকা আর যোগাড় হইল না, অমল হতাশ হইয়া সন্ধ্যার সময় ট্রেণে উঠিল।

এদিকে বর যথাসময়ে আসিয়াছে,—লগ্নও উপস্থিত। বরকে সম্প্রদানের জন্য লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলে, বরকর্ত্তা বিশম্ভর চৌধুরী অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—"তা'র আর কথা কি! তবে তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই ;—বরং ততক্ষণ ও-দিকটা সেরে ফেল্‌লে হয় না? কি বলেন চক্কোত্তি মশায়?"

শিয়ালদহ পুলিশ-কোর্টের মোক্তার নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী-মহাশয়ের প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন— "হ্যাঁ, তা' বটেই ত! টাকাকড়ির ব্যাপার একটু সময়-সাপেক্ষ; বাকীটা বরং পুরুত-ঠাকুর আর মেয়েরা একটু হাত চালিয়ে সেরে নিতে পারেন।"

সতীশ যখন জানাইলেন যে সমস্ত টাকা এখনও সংগ্রহ হইয়া উঠে নাই, জামাই কলিকাতায় টাকার চেষ্টায় গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিলেই সব টাকা দেওয়া যাইবে, তখন চক্রবর্ত্তী প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"তা, বেশ ত, বেশ ত,—আসুক না। ব্যস্ত হ'বার কোন প্রয়োজন নেই,— অনেক রাত পর্য্যন্ত লগ্ন আছে। আর বরও একটু ক্লান্ত আছে, সেই বেলা তিনটের সময় বাড়ী থেকে রওনা হয়েচে, তা'র ওপর উপবাস, আর দারুণ গরম। বেচারী একটু বিশ্রাম করুক,—আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না। আমি বলি কি, ততক্ষণ বরং ইয়ে করলে হয় না? একটা কাজ এগিয়ে থাকে,—বরযাত্রীদের কতক কতক বসিয়ে দিলে-?"

"যে আজ্ঞে, তাই বন্দোবস্ত ক'রে দি"—বলিয়া জ্যোতিষ অতি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

অমলের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সকলের যেমন উদ্বেগ হইতেছিল, তেমনি আবার একটু আশাও হইতেছিল যে, যখন এত দেরী হইতেছে, নিশ্চয়ই, টাকার একটা যোগাড় করিয়া আসিবে। কিন্তু অমল যখন আসিল তখন সকল আশার অবসান হইল এবং উদ্বেগ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

জ্যোতিষ তখন চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি টাকা কিছুতেই বাকী রাখিতে প্রস্তুত নহেন। জ্যোতিষ অগত্যা

হ্যাণ্ড্‌নোট পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী জনান্তিকে বুঝাইয়া দিলেন যে হ্যাণ্ড্‌নোট আইনে না টিকিতে পারে,—বিপদে ফেলিয়া ভয় দেখাইয়া লিখাইয়া লইয়াছে বলিলে আদালতে অগ্রাহ্য হইতে পারে।

তখন সতীশ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে আসিলেন। অমল যে অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছিল তাহাই জামিন রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য এক সপ্তাহের সময় চাহিলেন। চৌধুরী-মহাশয় এ প্রস্তাবে যেন একটু নরম হইলেন, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর পরামর্শ না লইয়া কিছু বলিতে পারিলেন না।

চক্রবর্ত্তীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এ-কথা বলিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আরে না না! এমন কাজও কর্‌বেন না। কা'র জিনিষ তা'র ঠিক নেই, নিয়ে শেষে বিপদে পড়্‌বেন? মনে করুন যদি চোরাই মালই হয়!''

দূর হইতে চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। শেষের কথাটা শুনিয়া সতীশ রুখিয়া আসিলেন, বরযাত্রীরা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল,—মুহূর্ত্ত-মধ্যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বাধিয়া গেল। এই গোলযোগের ভিতর চৌধুরী-মহাশয় বর তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন। যে গাড়ীতে বর আসিয়াছিল, দূরদর্শী চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতেই তাহা আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন,—বরকে তুলিয়া লইয়া গাড়ী তৎক্ষণাৎ ছুটিল।

৯

ব্যাপার দেখিয়া জ্যোতিষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সতীশ মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে বাটীর ভিতর গিয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া, দালানে একটা তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। বীণা ছুটিয়া আসিল। পিতার বিকৃতি কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বড় ভয় পাইল, তাড়াতাড়ি একখানা পাখা আনিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

বাহিরে এইমাত্র যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকী ছিল না; সুতরাং বীণা ম্লান মুখে নীরবে পিতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সতীশ বলিলেন—"তুই বল্ মা, এখন কি উপায় করা যায়,—আমার বুদ্ধিতে ত আর কুলায় না। আর এ বিভ্রাট ত আমার বুদ্ধির দোষেই ঘটেছে। জ্যোতিষ আমার ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ছিল, এখন কি করি! এ দায় ত জ্যোতিষের নয়—আমার!"

বীণা পিতার কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এ সময়ে এত অধৈর্য্য হ'লে চল্‌বে কেন, বাবা! অন্য কোন পাত্র যোগাড় ক'রে শুভকার্য্য সেরে নিতে হ'বে,—অন্য উপায় কি আছে?"

সতীশ হতাশভাবে উত্তর করিলেন—"সে উপায়ও ত দেখ্‌ছি না। লগ্ন আর বেশীক্ষণ নেই, আর তেমন পাত্রই বা কই?"

বীণা বলিল—"কেন, এত বড় গ্রামে এমন একটাও পাত্র খুঁজ্‌লে পাওয়া যায় না? ভাল না-ই বা হ'ল।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সতীশ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"কই, তেমন কাউকেই ত দেখ্‌ছি না।"

পিতার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বীণা কহিল—"ঠিক বল্‌ছ বাবা? ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি কেউ আছে কি না। হয় ত এইখানেই কেউ আছে—"

কন্যার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সতীশ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—"হুঁ, কিন্তু তা' হয় না মা, তা' হয় না।"

বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কেন হ'বে না বাবা! যে একবার কন্যাদায় থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছে, এবারও সেই করবে,—এ যে তা'র চেয়েও বড় দায়, বাবা। আচ্ছা, তুমি এখন একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক দেখি,—আমি এখনি আস্‌ছি।"

এই বলিয়া বীণা বিদ্যুৎ-বেগে বাহির হইয়া গেল, পিতাকে একটি কথা বলিবারও অবকাশ দিল না।

বাহির-বাটীতে জ্যোতিষ তখনও তেমনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন; অমল কোমরে গামছা জড়াইতে জড়াইতে আস্ফালন করিয়া বলিতেছে—"আপনারা হুকুম দেন ত এখনও গিয়ে বরকে ধ'রে আন্‌তে পারি। ভোর তিনটার আগে আর ট্রেন নেই,—যা'বে কোথা!"

বীণা দরজার নিকট হইতে অমলকে ডাকিল, এবং চেলীর জোড় তাহার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"পরো।"

অমল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল; রুদ্ধস্বরে বলিল—"পর্‌ব!—আমি!—কেন?"

বীণা অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমি বল্‌চি—তাই।"

এইবার অমল বীণার উদ্দেশ্য বুঝিল। অন্য সময়ে হইলে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু সে চাহিয়া দেখিল বীণার প্রশান্ত মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত, নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! এত দিন যাহাকে সরলা মুগ্ধা বালিকা-রূপে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার এই মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি রহিল না। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চেলীর জোড় হাতে লইয়া অমল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বীণার অনুবর্ত্তী হইল।

জ্যোতিষের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বাহিরে হাঁকাহাঁকি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে, জ্ঞান-সঞ্চার হইলেও, নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সহসা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ছুটিতে ছুটিতে একেবারে বাহির-বাটীতে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন কন্যা-সম্প্রদান হইতেছে,—বীণা স্বহস্তে অমল এবং ঊষার সংযুক্ত করে ফুলের মালা জড়াইয়া দিতেছে! উপস্থিত সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ। কেবল একজনের চোখে-মুখে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—যে অকাতরে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারে, স্বামীর অকল্যাণ ছাড়া যে আর সব সহিতে পারে!

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বীণা, এ কি করলি মা?—শেষে এই হ'ল?"

অমলের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিজয়োৎফুল্ল বদনে মধুর হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল—"কেন কাকীমা, এ মন্দ কি হ'ল? ঊষাকে সতীন করব বলেছিলুম,—মনে নেই? আজ সেই কথাই ফ'লে গেল বই ত নয়!"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"তা' ব'লে একটা মুখের কথার জন্যে—"

বীণা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"মানুষের সব কথাই মুখ দিয়ে বা'র হয়, কাকীমা। তা'র মধ্যে কোন্‌টা যে তা'র অন্তরের কথা তা' কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন, আর এই রকম ক'রেই বুঝিয়ে দেন!"

আবার মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হইল। তাহা সেই নিথর নিশ্চল বায়ুস্তরে মিশিয়া নীরব হইলেও একটি সরলা পল্লীবালার এই বিজয়-বার্ত্তা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

"ভারতবর্ষ"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯।

কাঙ্গালের দান

১

মেয়েটার নাম ছিল কুড়ানী। আর এই কুড়ানী নামই তাহার একমাত্র পরিচয়। তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কেহ কিছু জানে না। সে যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহা কিছুই নির্ণয় হয় নাই।

যেদিন সে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে প্রথম আসিয়া জুটিল, সেদিন রবিবার। মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী সকালে চা পান করিয়া গামছা হাতে বাহির হইয়াছেন, তখনও বাজার করিয়া ফিরেন নাই। জজ্-আদালতের চাকরি, সারাদিনের খাটুনির পর বাড়ী আসিতে বিলম্ব হয়। কাজেই, ছুটির দিন ছাড়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাঁচটা বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার বা একটু গল্প-গুজব করিবার অবসর পান না। আজ সেইজন্যই ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে।

যাহা হউক, সেজন্য কোন উদ্বেগ নাই,—মহেন্দ্রের স্ত্রী সারদাসুন্দরী বেশ নিশ্চিন্ত মনে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত।

একবার কি জন্য বাহিরে আসিতেই সারদা দেখিল, রান্নাঘরের দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে এক মলিনবসনা ভিক্ষুক-বালা। সে যে

কতক্ষণ আসিয়া এমন চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে, সেই জানে! সারদাকে দেখিয়াই সে ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—"বুম্মা, বাত!"

সারদা তাহার এই অস্ফুট ধ্বনির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সরায় করিয়া কিছু চাউল আনিয়া তাহাকে দিতে গেল। সে তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"বাত দাও, কাবো।" এবং ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার বক্তব্য বুঝাইয়া দিল। সারদা তখন দু'টি পয়সা আনিয়া দিতে গেল। বলিল—"এই নে, দোকান থেকে কিছু কিনে খাস্।" ভিখারিণী তাহাও লইল না, বলিল—"না বাত দাও।" তাহার বড় বড় চোখ দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল।

সারদা আর থাকিতে পারিল না। উঠানে আমগাছের তলায় কলা-পাতা পাতিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া দিল। ভিখারিণী পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া, উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিয়া, খিড়কীর ঘাটে হাত-মুখ ধুইয়া আসিল। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া আবার সেই খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিল।

তাহাকে পয়সা দু'টি আনিয়া দিয়া সারদা বলিল—"খাওয়া হ'ল, এবার ঘরে যা।" সে পয়সাও লইল না, নড়িলও না; প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

এ ত বড় মুস্কিল করিল,—কিছুতেই বিদায় হইতে চায় না!

সারদা বলিল—"তুই কোথায় থাকিস্?"

সে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল,—"কুত্তাও না।"

"তোর আর কে আছে?"

"কেউ না।"

"তোর নাম কি ?"

"কিচ্ছু না।"

"কোথায় যাবি, কোথায় থাক্‌বি ?"

"কুত্তাও না"—বলিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

সারদা হাল ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

২

মেয়েটা সেই অবধি চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। তাহাকে বিদায় করিবার জন্য অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। মহেন্দ্র বিস্তর লোককে তাহার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সে যে কে, এবং কোথা হইতে আসিয়াছে, কেহই তাহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না। মহেন্দ্র তখন সারদাকে বুঝাইলেন—"ও যেমন আছে এখন তেমনই থাক্। পাগলের মন ত,—কোন সময় হয়ত নিজেই স'রে পড়্‌বে। আর, থাক্‌লে তোমারও ত কতকটা সাহায্য হয়,—যতটুকু পার খাটিয়ে নাও না।"

সারদা বলিল—"তা না হয় এখন হ'ল। কিন্তু ওকে বরাবরের মতন বাড়ীতে রাখা যায় কি ক'রে ? কে, কি জাত, তা'র ঠিক নেই। তা'ছাড়া উঠ্‌তি বয়েস, দেখ্‌তে অমন রোগা হ'লেও পনেরো-ষোলর কম নয়,—আর চেহারাও নেহাৎ দুলে-বাগ্দির মতন ত নয়! বাড়ীতে একটা জোয়ান ছেলে থাক্‌তে, অমন সোমত্ত মেয়েটাকে—"

মহেন্দ্রকে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিতে দেখিয়া সারদা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"হাস্‌ছ কি! অসম্ভব কিছুই নয়। তোমাদের পুরুষ জাতটাকে মোটেই বিশ্বাস নেই। এই দেখ না, আমার মামার বাড়ীতেই—"

"আর থাক্‌না, তোমার মামার বাড়ীর কীর্ত্তির কথা ত ঢের শুনেছি।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অমন কীর্ত্তি অনেকেরই আছে,—ধরা পড়েছে কেবল বঙ্কু-মামা!'

যে জোয়ান ছেলের কথা হইতেছিল সে আর কেহ নয়, মহেন্দ্রের ছোট ভাই নরেন। তাহার বিদ্যাশিক্ষা কিছুদিন মন্দগতিতে চলিয়া সম্প্রতি হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। এখন সে আদালতের সেরেস্তায় একটু-আধটু নকল-নবিসের কাজ করে, বাকী সময়টা মাছ ধরিয়া, তাস খেলিয়া, বাঁশী বাজাইয়া কাটায়। এ অবস্থায় অবিলম্বে তাহার একটা বিবাহ দিয়া ফেলাই সনাতন ব্যবস্থা। আর তাহাতে সংসারের একটু সুবিধাও হয়। আজকাল সারদার নিজের শরীর ভাল থাকে না। এক এক সময়ে পেটের যন্ত্রনায় উঠিয়া বসিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় সে একা কি কষ্টে যে সংসার চালাইতেছে, মহেন্দ্র তাহার কোন খবর রাখেন না। তাই ভা'য়ের বিবাহ দিবার কোন চেষ্টাই নাই।

সে যাহা হউক, তখনকার মত এই অজ্ঞাতকুলশীলা কুড়াইয়া পাওয়া মেয়েটাকে 'কুড়ানী' নাম দিয়া সারদা গৃহে আশ্রয় দিল বটে, কিন্তু একটা অস্বস্তি থাকিয়া গেল। কিরূপে মেয়েটাকে বিদায় করা যায় এ চিন্তা ঘুচিল না।

স্ত্রীজাতির নাকি স্বভাবতঃ একটু কূট বুদ্ধি হয়; তাই সারদা ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার চাণক্য-পণ্ডিতের 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' নীতি অবলম্বন করিয়া দেখিল।

একদিন সে নরেনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"কোথা থেকে এক হাবা-পাগ্‌লা মেয়ে এসে জুটেছে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গেলে।

না একটা কথা বল্‌লে বোঝে, না ওর কথা আমরাই বুঝি। মাথায় একরত্তি বুদ্ধি নেই,—কচি-ছেলেরও অধম। ওটা বিদেয় হ'লে যে বাঁচি গা! কিন্তু ছুঁড়ি ত কিছুতেই নড়্‌বে না! কি বিপদেই পড়া গেছে!"

নরেন এই কথা শুনিয়া কুড়ানীকে তাড়া করিয়া যাইতেই, সে উঠান হইতে আঁশবঁটি তুলিয়া লইয়া এমন রণরঙ্গিনী ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে সারদা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। নরেনের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল—"ও পাগলকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, ঠাকুরপো,—কখন কি ক'রে বস্‌বে শেষে। তা'র চেয়ে এসে জুটেছে যখন, থাক্। কি আর হ'বে।"

এই ঘটনার পর হইতে নরেনকে দেখিলেই কুড়ানী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, নরেনও দূরে দূরে থাকে। তাহাতে আর যাহাই হউক, ইহাদের সম্বন্ধে সারদার মনে যে উদ্বেগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার আর কোন ভিত্তি রহিল না। এইরূপে সারদা উপাখ্যানের একচক্ষু হরিণের মত নিঃশঙ্কচিত্তে কেবল যে কুড়াণীকে আশ্রয় দিল তাহা নয়, ক্রমশঃ নিবিড় স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

৩

চৌদ্দ বৎসর হইল সারদার বিবাহ হইয়াছে, এখন তাহার বয়স পঁচিশ। বহুদিন পূর্ব্বে তাহার একটি সন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আর হয় নাই, আর হইবার আশাও অল্প। এত দিন আশায় আশায় এক রকম কাটিয়াছে। যখন সে আশার অবলম্বন ক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন বহুদিন পূর্ব্বে যে শিশুটিকে সে হারাইয়াছে তাহার স্মৃতি সারদার প্রাণে নূতন করিয়া একটা বেদনার সৃষ্টি করিল। মনে হইল,

দু'দিনের জন্য আসিয়া সেই শিশুটি কি শত্রুতাই করিয়া গিয়াছে,—হৃদয়ে কেবল একটা ক্ষুধা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে, সারা জীবনে যাহা মিটিবার নয়। নারী-হৃদয়ের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা যখন নিতান্তই নিষ্ফল হইতে বসিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সারদা এই একটি প্রাণীকে কুড়াইয়া পাইল, যে বয়সে তাহার সন্তান-স্থানীয় না হইলেও শিশুরই মত জ্ঞানহীন, ভাষাহীন, অসহায়।

তাই কুড়ানীর আদর-যত্ন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহেন্দ্রকে বলিয়া তাহার জন্য নূতন জামা-কাপড় আসিল। বাড়ীতে ফেরিওয়ালা ডাকিয়া জামা, কাপড়, চুড়ি, খেলনা প্রভৃতি কেনা হইল। সদর দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিতেই নীচের তলায় যে ছোট ঘরখানি এতদিন পুরাতন জিনিষ-পত্রে বোঝাই ছিল, তাহা খালি করিয়া কুড়ানীকে থাকিতে দেওয়া হইল।

ক্রমে কুড়ানী এই ছোট পরিবাঃটির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া গেল। দিন দিন তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতিও হইতে লাগিল। একটি একটি করিয়া সে এখন অনেক জিনিষের নাম শিখিয়াছে এবং অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতেও চেষ্টা করে। গোড়ায় গোড়ায় সে সারদাকে বলিত 'বুম্মা',— সম্ভবতঃ 'বৌমা' শব্দের অপভ্রংশ, আর মহেন্দ্রকে বলিত 'বাব্বু'। এই দুইটি শব্দ তাহার রহস্যাবৃত অতীত জীবনের স্মৃতি। সারদা কিন্তু 'বৌমা' কথাটার উপযোগিতা দেখিল না, তাই তাহাকে 'দিদি' বলিতে শিখাইল।

ঘরের খুঁটিনাটি অনেক কাজ কুড়ানী এখন করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলে না, খেয়ালের মাথায় যখন যতটুকু ইচ্ছা

করে। আবার যখন ঝোঁক চাপে, তখন তাহার কাজ আর শেষ হয় না। একদিন তাহাকে আলু ছাড়াইবার প্রক্রিয়া হাতে ধরিয়া শিখাইয়া দিলে, কাজটা তাহার এত ভাল লাগিয়া গেল, যে ঝুড়িতে যত আলু ছিল—দু'সের আন্দাজ—সবগুলি ছাড়াইয়া শেষ করিয়া তবে উঠিল। কিন্তু বলিয়া না দিলে নিজের ইচ্ছায় প্রায় কোন কাজই করে না। কেবল একটা কাজ সে নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছে,—মহেন্দ্রের পরিচর্য্যা। সকালে গাড়ু-গামছা যোগাইয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রে আহারের পর পান আনিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, সমস্তই সে নিজের মনে নিয়মিত ভাবে করিয়া যায়।

মহেন্দ্র দেখিলেন সারদা ঠিকই বলিয়াছিল। খাইতে পরিতে পাইয়া কুড়ানীর চেহারা বেশ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাহার শীর্ণ দেহ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, গাত্রবর্ণ পরিচ্ছন্নতার গুণে উজ্জ্বল হইয়াছে। সর্ব্বোপরি, যৌবনের তুলিকাস্পর্শে তাহার সারা অঙ্গে একটা নূতন শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহার দেহের রূপ যেমন বয়সের অনুপাতে বিকশিত হইয়া উঠিল, মনোবৃত্তির তেমন ক্রমোন্নতি হইল না,—হইলেও তাহা বাহিরে প্রকাশ হইবার উপায় ছিল না। হয়ত তাহার প্রাণেও নব নব আশা আকাঙ্ক্ষা উন্মিষিত হইয়া মরু-কুসুমের মত শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এ সংবাদ তাহার অলস চক্ষু দু'টির মৌন ভাষায় যতটুকু প্রকাশ হইতেছিল কেহ তাহা বুঝিল না।

৪

একদিন বৈকালে মহেন্দ্র কাছারি হইতে আসিয়া শুনিলেন কুড়ানীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বাড়ীর বাহিরে সে বেশী যায় না; তাহাকে লইয়া সকলে রঙ্গ করে বলিয়া পাড়ার কাহারও সহিত তেমন মিশে না। আজ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে এতক্ষণেও ফিরিল না দেখিয়া সারদা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সংবাদ শুনিয়া মহেন্দ্র একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন—"আমি ত আগেই বলেছি,—পাগলের মন, যখন খেয়াল হ'বে আপনিই চ'লে যা'বে। তুমি ত তখন ওকে তাড়া'বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলে। নিজেই যখন চ'লে গেল—"

সারদা বলিল—"ও কি কথা গো! সন্ধ্যে হ'তে যায়, সোমত্ত মেয়েটা কোথায় চ'লে গেল,—তোমার একটু ভাবনা হচ্ছে না? তখনকার কথা ছেড়ে দাও। এখন আমাদের আশ্রয়ে যখন রয়েছে—"

"না না, আমি তামাসা ক'রে বল্‌ছিলাম,—সত্যি কি আর—"

"ও রকম তামাসা ভাল লাগে না, হ্যাঁ। চট্ ক'রে জল খেয়ে নিয়ে তুমি একবার বেরিয়ে দেখ। ঠাকুরপোকে পাড়ায় খুঁজ্‌তে পাঠিয়েছিলাম,—পাওয়া গেল না। এখন আবার দক্ষিণ-পাড়ার দিকে গেছে,—যদি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে। ও সব কাণ্ড যত ঐ দিকেই ত হয়।"

পথে বাহির হইয়া, মহেন্দ্র কোথায় খুঁজিতে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। শেষে মনে করিলেন থানায় খবর দিয়া পরে খোঁজাখুঁজি করা যাইবে। ষ্টেশনের রাস্তার মোড়ে পৌঁছিয়া ভাবিলেন, যদি কেহ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া থাকে ট্রেণে পলাইবার চেষ্টা করিবে। ষ্টেশনের দুই-একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, মনে করিলেন তাহাদের একটু নজর রাখিতে বলিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনের কাছে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন একটা ময়রার দোকানের সম্মুখে কুড়ানী খাবারের ঠোঙা হাতে উদাস নয়নে চাহিয়া বসিয়া আছে। মহেন্দ্রকে দেখিয়া সে ঠোঙা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল,—মুখে একটা অস্ফুট করুণ ধ্বনি।

ঠিক সেই সময়ে দুইদিক হইতে দুইজন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। একজনের হাতে ছোরা দেখিয়া মহেন্দ্র তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা কাছে আসিলে তাহার পেটে এক লাথি মারিতেই সে পড়িয়া গেল। কিন্তু ছোরার আঘাতে মহেন্দ্রের পায়ে বিষম চোট লাগিল,—তিনি বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেই আক্রমণকারীরা পলাইল। কয়েকজন তাহাদের ধরিবার চেষ্টায় ছুটিল। যাহারা রহিল তাহারা মহেন্দ্রের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া, গাড়ী ডাকিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

গাড়ীতে উঠিয়াও কুড়ানীর ভয় গেল না, মহেন্দ্রের পাশে বসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। তাহার কোমল স্পর্শে মহেন্দ্র ক্ষতের জ্বালা ভুলিয়া, একটা মধুর আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরে কুড়ানীর প্রাণে যে একটা ভয় ঢুকিয়াছে তাহা বেশ দেখা গেল। সে আর এখন একবারও বাড়ীর বাহির হয় না, সর্ব্বদাই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল যতক্ষণ মহেন্দ্রের কাছে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করে, ততক্ষণ তাহার চোখে-মুখে একটা শান্ত নিরুদ্বেগের ভাব ছড়াইয়া থাকে।

৫

পায়ের ঘা সারিতে বেশীদিন লাগিল না। তথাপি ছুটি পাওনা ছিল বলিয়া, এই উপলক্ষ্যে মহেন্দ্র এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী বসিয়া রহিলেন। প্রথম যে কয়দিন পা লইয়া ভুগিতে হইয়াছিল, কুড়ানী সদাসর্ব্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিত একান্ত মনে তাঁহার সেবা করিয়া যাইত। রাত্রেও নিজের ঘরে গিয়া :শুইতে চাহিত না, বলিত—"না, বয় !" অগত্যা মহেন্দ্রের শয়নকক্ষেরই এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিত।

মহেন্দ্র বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে পর, সারদা একদিন বৈকালে দেখিল কুড়ানী তাহার বিছানা-মাদুর গুটাইয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। সারদা বলিল—"কি রে, তল্পিতল্পা নিয়ে কোথায় চল্‌লি ?" নীরব অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে কুড়ানী তাহার নিজের ঘরটি দেখাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

ছুটি ফুরাইতে তখনও বিলম্ব ছিল। সুস্থ শরীরে দিবা-রাত্র বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া মহেন্দ্রের ক্রমে বিরক্তি ধরিয়া গেল। কাজেই সন্ধ্যার সময় একবার বেড়াইতে বাহির হওয়া আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। আড্ডা

দিবার ঝোঁক তাঁহার কোনদিনই ছিল না, কালে-ভদ্রে ছুটির দিনে তাস-পাশার আসরে গিয়া জুটিতেন। এখন তাহা ক্রমে নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া এক-একদিন ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যায়, সারদাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হেঁসেল আগ্‌লাইয়া থাকিতে হয়। তাই মহেন্দ্র সন্ধ্যার পরেই আহার সারিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে এই নেশাটা বেশ ভাল করিয়াই জমিয়া উঠিল। তাই ছুটি যখন ফুরাইল, তখনও কাছারি হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার পর বাহির হওয়ার অভ্যাসটা থাকিয়া গেল। রাত্রের আহার সারিয়া যান, সুতরাং বাড়ী ফিরিবার তাড়া থাকে না। সারদা প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়ে। শিকল নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিলে নীচে নামিয়া আসিবার পূর্ব্বেই কুড়ানী সদর-দরজা খুলিয়া দেয়। কাজেই সারদা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, মহেন্দ্র কখন আসেন অনেক দিন জানিতেই পারে না।

কুড়ানীকে লইয়া আর কোন গোল হয় নাই। কিন্তু মহেন্দ্রের বোধ হয় মনে মনে ইচ্ছা যে, এই গলগ্রহটাকে সরাইয়া দিয়া একটা দায়িত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিছুদিন হইতে তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। একদিন সারদাকে বলিলেন, দেওয়ানপাড়ায় একটা অনাথ-আশ্রম আছে, সেখানেই কুড়ানীকে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সারদা প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হয় না। কিন্তু মহেন্দ্র বুঝাইলেন যে, এই অজ্ঞাতকুলশীলা অপরিণত-বুদ্ধি মেয়েটাকে চিরকাল পুষিতে হইলে পরে অনেক ভুগিতে হইবে। সেখানে থাকিলে তাহাদের কোনও ভাবনা বা দায়িত্ব থাকিবে না, সেও বেশ যত্নে থাকিবে, কোনও কষ্ট হইবে না। এতগুলি যুক্তিতর্ক শুনিয়া সারদা অগত্যা রাজী হইল।

৬

তাহার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র সারদাকে মধ্যে মধ্যে কুড়ানীর সংবাদ আনিয়া দেন। পূজার ছুটিতে তাহাকে কয়েকদিনের জন্য বাড়ীতে আনাও হইয়াছিল। তখন তাহার নূতন শ্রী দেখিয়া সারদার চোখ জুড়াইল। সে যে এখন বেশ সুখেই আছে তাহা বুঝিয়া সারদা আশ্বস্ত হইল। তাই সেবার কুড়ানী যখন আবার চলিয়া গেল, সারদা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে বিদায় দিল।

মহেন্দ্রের এখনও রাত্রে বাড়া ফিরিতে সেইরূপ বিলম্ব হয়। তবে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ বাহির হওয়ার অভ্যাস আর নাই। কাজের ভিড়ে যেদিন কাছারি হইতে ফিরিতে বিলম্ব হয় সেদিন আর যাওয়া ঘটে না।

একদিন মহেন্দ্র বাহির হইয়াছেন ; সারদা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখন কুড়ানী নাই যে দরজা খুলিয়া দিবে। নরেনের ঘর হইতে শিকল নাড়ার শব্দ ভাল শোনা যায় না। কাজেই, সারদা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে না। আজও হঠাৎ একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল একটা বাজে,—মহেন্দ্র তখনও আসেন নাই। তাই ত, এত দেরি ত কখনও হয় না! ভাবিল, আর একটু দেখিয়া নরেনকে তুলিয়া একবার খোঁজ লইতে পাঠাইবে।

কান খাড়া করিয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমে যখন দেড়টা বাজিয়া গেল, তখন নরেনকে ডাকিয়া তুলিতে হইল। তাসের আসর সব দিন একস্থানে হয় না। কোথায় কোথায় সন্ধান লওয়া দরকার, দু'জনে মিলিয়া তাহা ঠিক করিয়া, লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া নরেন বাহির হইল।

মহেন্দ্র তখন সহরের এক প্রান্তে একটা ছোট একতলা বাড়ীর একটি কুঠারিতে তক্তপোষের উপর বসিয়া তামাক ধরাইতেছেন,—অদূরে কুড়ানী বিষণ্ণ মুখে উপবিষ্ট।

এদিকে নরেন পাঁচ-সাত জায়গায় ঘুরিয়াও মহেন্দ্রের কোন সন্ধান না পাইয়া ম্লান মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সারদার উদ্বেগ ও আশঙ্কার সীমা রহিল না। বাকি রাত্রিটুকু কোনরূপে কাটাইয়া, ভোর হইতেই নরেন যখন আবার বাহির হইতেছে, তখন মহেন্দ্র ফিরিলেন।

ও-পাড়ার গয়লাদের একটি ছেলের নাকি কলেরা হইয়াছিল, তাই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলিলেন—"অনুকূল ডাক্তারকেও আনা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ওযুধের ব্যবস্থা ক'রেই চ'লে গেলেন। আমাকে থেকে যেতে হ'ল,—অমন সঙ্গীন্ কেস্, ফে'লে আসি কি ক'রে।... কিন্তু আমি ত খবর দিতে লোক পাঠিয়েছিলাম—আসেনি?"

সারদা শুষ্ক মুখে উত্তর করিল—"কই, আসেনি ত কেউ। কিংবা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ডেকে ফিরে গেছে।"

আদালতের চাকরি জুটিবার পূর্ব্বে মহেন্দ্র কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। ও রকম অনেকেই পড়ে, আবার একটা কাজকর্ম্মের সুবিধা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। মহেন্দ্র কিন্তু হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা বরাবরই রাখিয়াছেন। এখনও ছেলেপুলের সর্দ্দি-কাশি হইলে পাড়ার অনেকেই আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। কিন্তু এমন 'সঙ্গীন্ কেস্' কখনও তাঁহার হাতে আসিতে সারদা দেখে নাই। তথাপি এ সব সংশয়ের কথা সারদার মনে আসিল না, মহেন্দ্র যে ভালয়-ভালয় বাড়ী ফিরিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।

ইহার পর কয়দিন মহেন্দ্রের কাছারি হইতে ফিরিতে বিলম্ব হয়। রাত্রে আর তাস খেলিতে যাওয়া ঘটে না।

৭

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সকালে কুড়ানীর আবির্ভাব। সেদিনও রবিবার। মহেন্দ্র বাজার গিয়াছেন, সারদা হেঁসেলে। কুড়ানী নিঃশব্দে আসিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত খুঁটিটিতে ঠেস্ দিয়া তেমনই ম্লান মুখে বসিয়া রহিল।

সারদা বাহিরে আসিয়া কুড়ানীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে এমন সময়ে কি করিয়া কাহার সহিত আসিল! কুড়ানী তাহার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে যে উত্তর দিল, তাহাতে সে যে একলা আসিয়াছে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল।

সারদা বলিল—"হঠাৎ এমন চলে এলি যে? পালিয়ে এসেছিস্ বুঝি,—কেন রে?"

ভীতি-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া কুড়ানী বলিল—"বয়! ওয়া মাব্বে!"

তাহাকে প্রবোধ দিয়া সারদা বলিল—"না না, মারবে কি, শুধু শুধু অমনি মারলেই হ'ল! আচ্ছা আমি বাবুকে বলব—ওরা তোকে কক্ষনো মারবে না। এখন এসেচিস্, দু-চার দিন থাক। তারপর একদিন ওঁর সঙ্গে যাস্ 'খন। তোর কোনও ভয় নেই, বুঝ্‌লি?"

কিন্তু কুড়ানী কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। সেখানে ফিরিয়া যাইতে যে তাহার ঘোর অনিচ্ছা, তাহা সে বেশ জোরের সহিত জানাইয়া

দিলেও, সারদা যখন আবার বুঝাইতে গেল, তখন সে উচ্ছ্বসিত অভিমান ভরে কাঁদিয়া ফেলিল। সারদা কাছে বসিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করিল।

সহসা সারদা চমকিয়া উঠিল;—কুড়ানীর দেহে এমন মাতৃত্বের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিল কোথা হইতে! কুড়ানীকে জিজ্ঞাসা করিতে সে কিছুই বলিল না,—কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। সারদা হতবুদ্ধি হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্র বাজার করিয়া আসিলে, সারদা তখনই তাঁহাকে কুড়ানীর কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাম্‌লাইয়া গেল। ভাবিল, মানুষটা তাতিয়া-পুড়িয়া আসিয়াছে, সংবাদটা এখন শুনাইয়া কাজ নাই।

তারপর মহেন্দ্র যখন আহারান্তে পান মুখে দিয়া হুঁকা লইয়া বসিলেন, তখন সারদা তাঁহাকে কুড়ানী-সংক্রান্ত এই কুৎসিত কাহিনী না শুনাইয়া আর থাকিতে পারিল না। শুনিয়া মহেন্দ্র নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সারদা দৃপ্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"সাধে কি বলেছিলাম তোমাদের পুরুষ জাতটাকে মোটেই বিশ্বাস নেই! এমন একটা অজ্ঞান, অনাথা, অসহায়া মেয়ে—যে শিশুর মতন নির্দ্দোষ, ফুলের মতন পবিত্র—তা'র এত বড় সর্ব্বনাশ যে করতে পারে সে কি মানুষ! ছি ছি, লজ্জায় ঘেন্নায় আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে। আর দোষ সত্যি আমাদেরও আছে। এখানে ছিল, বেশ ছিল,—কেন মরতে তোমার কথা শুনে—"

উদ্গত অশ্রুর বেগ রোধ করিতে না পারিয়া সারদা সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া, অন্তরালে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অকস্মাৎ এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়া এবং পুরুষজাতির এতবড় একটা কলঙ্কের প্রমাণ পাইয়া, তীব্র গ্লানি ও ক্ষোভে মহেন্দ্রের হৃদয় ভরিয়া গিয়া থাকিবে,—নতুবা এমন মুহ্যমান হইয়া এতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন কেন ?

তখন হইতে সারদার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ,—মহেন্দ্রও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

দিন চারেক পরে মহেন্দ্র কুড়ানীকে পুনরায় 'অনাথ-আশ্রমে' রাখিয়া আসিবার কথা উত্থাপন করিতেই সারদা বলিয়া উঠিল—"ওমা, তুমি কি গো! ওটাকে আবার সেই নরকে ফেলে রেখে আস্‌তে চাইছ ?"

মহেন্দ্র একটু নরম স্বরে উত্তর করিলেন—"সেখানে না হ'ক, আর কোথাও ওর একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে হ'বে ত।"

"না, ও আর কোথাও যা'বে না"—সারদা দৃঢ়স্বরে সংক্ষেপে এই উত্তর দিল।

মহেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বলিলেন—"তবে কি নিজের ঘরে এ পাপ পুষে রাখ্‌তে হ'বে ? তা' হ'বে না, ওকে এখান থেকে বিদায় করতে হ'বে।"

সারদা তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"ও কি কথা গো! তুমি কি মানুষ ? ওর এখন এই অবস্থা, এ সময়ে ...। না, সে হ'বে না,— ও এখানেই থাক্‌বে। আর পাপ ত ওর নয়,—ও ত আমাদের চেয়েও নিষ্পাপ, পবিত্র। আর একজনের পাপের শাস্তি এই নিরপরাধিনী মেয়েটাকেই ভুগ্‌তে হ'বে ? ও কথা আর মুখে এনো না—যাও।"

৮

যথা সময়ে কুড়ানীর ছেলে হইল। সারদা অম্লানচিত্তে সূতিকাগৃহে যাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেটাকে দেখিলেই একটা বিজাতীয় ঘৃণায় তাহার দেহ-মন ভরিয়া যায়। পাপে যাহার জন্ম, তাহাকে অশুচি জ্ঞানে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে এই অস্পৃশ্য ছেলেটার সকল ভারই ক্রমে সারদাকে লইতে হইল,—যখন কঠিন রোগে কুড়ানীর জীর্ণ দেহখানি শয্যার সহিত মিশিয়া গেল। দুই তিন মাস রোগ ভোগ করিয়া সে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেল, উঠিয়া বসিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। রোগের দারুণ ক্লেশ নীরবে সহ্য করিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত সে যেন কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া থাকে। তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দু'টি ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

সারদা বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। এদিকে সংসারের কাজ, ওদিকে ছেলেটার পরিচর্য্যা,—রোগিনীর কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। নরেন মাঝে মাঝে আসিয়া বসে বটে। কিন্তু তাহার সহিত এতদিনেও কুড়ানীর বনিবনাও হইল না। তাই নরেন যতক্ষণ থাকে, সে বিষম অবজ্ঞাভরে চোখ বুজিয়া নীরবে পড়িয়া থাকে।

সারদা মাঝে মাঝে ছেলেটাকে তাহার কাছে আনিয়া দেয়। তখন তাহার পাণ্ডুর মুখে একটা আনন্দের ছটা ফুটিয়া উঠে। ছেলেকে আদর করিয়া অস্ফুটস্বরে সে কত কি বলিবার চেষ্টা করে এবং থাকিয়া থাকিয়া সারদাকে বলে—"দিদি, বাবু ?"

মহেন্দ্রকে সারদা বলে—"ছুঁড়িটা তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে হেদিয়ে মরে, সময় মত মাঝে মাঝে একটু কাছে গিয়ে বস না।" মহেন্দ্র বিনা আপত্তিতে কুড়ানীর কাছে গিয়া একটু বসেন।

একদিন মহেন্দ্র কাছারি হইতে আসিলে সারদা বলিল—"আজ বড় ছট্‌ফট্‌ করচে। কাজকর্ম্ম ফেলে আমি সারাদিন ওর কাছেই ছিলাম। জলটল খেয়ে তুমি গিয়ে একটু বস্‌বে? আমি তা'হলে কাপড়টা কেচে এদিককার একটু ব্যবস্থা করি।"

মহেন্দ্রকে কুড়ানীর কাছে বসাইয়া সারদা বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই মনে পড়িল কুড়ানীকে ঔষধ দিবার সময় হইয়াছে। মহেন্দ্রকে সে কথা বলিতে গিয়া কুড়ানীর ঘরের কাছে আসিতেই, ঘরের ভিতরে একটা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট, শতসুখস্মৃতিবিজড়িত সুপরিচিত ধ্বনি শুনিয়া সারদা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। অদম্য কৌতূহলের বশে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া দেখিল—কুড়ানী মহেন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া দু'হাতে মহেন্দ্রের গলা বেষ্টন করিয়া আছে,—আর মহেন্দ্রের মাথাটা কুড়ানীর আনন্দোজ্জ্বল শীর্ণ মুখের উপর অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সারদা অবসন্ন দেহে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তারপর উঠিয়া দেওয়াল ধরিয়া অতি সন্তর্পণে চলিয়া গিয়া, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একটা মেঘ সরিয়া গিয়া চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল, তাহার বিবর্ণ মুখের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল। ছুটিয়া গিয়া কুড়ানীর ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং অজস্র চুম্বন বৃষ্টি করিয়া তাহাকে জাগাইয়া, কাঁদাইয়া বিষম বিব্রত করিয়া তুলিল।

৯

কুড়ানীর তৈলহীন জীবন-প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটি এক সময়ে নিতান্ত অতর্কিতভাবে নিবিয়া গেল। একটা দীন নিষ্ফল মানব-জীবনের অবসান হইল।

তাহার মৃত্যুতে চক্রবর্ত্তী-পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। সারদা কয়েকদিন ধরিয়া কাঁদিল, তারপর মাতৃহীন শিশুটিকে লইয়া অত্যাধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ভাল ভাল জামা, নূতন বিছানা, নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে সাজাইয়া, খাওয়াইয়া, নাচাইয়া, খেলাইয়া সারদার দিন কাটে। সংসারের কাজ কতক হয়, কতক পড়িয়া থাকে।

মহেন্দ্রের মনটা কিন্তু এত সহজে হাল্কা হইল না, কি যেন একটা দুশ্চিন্তা লাগিয়া রহিল।

একদিন কয়েকজন লোক আসিয়া মহেন্দ্রকে ডাকিলে, তিনি তাহাদের বসিতে বলিয়া সারদাকে আসিয়া বলিলেন—"ছেলেটাকে একবার দাও ত।"

সারদা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"কেন?"

"ঐ একজনরা ওটাকে নিতে রাজী হয়েচে, তাই এসেছে একবার দেখ্‌তে।"

"সে কি! তা' হ'বে না। ছেলে আমি দেবো না।"

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন মিছামিছি মায়া বাড়াচ্ছ? কি হ'বে ওটাকে পুষে,—কোথাকার কে, কা'র ছেলে—".

সারদা দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল—"এ আমার ছেলে! কেবল পেটে ধর্‌তে পারিনি এই যা। দু'দিনের তরে এসেছিল একটা কাঙ্গাল। কিন্তু ঐ কাঙ্গালের দান পেয়েই আমার আজ রাজরাণীর ঐশ্বর্য্য। আমি আজ মা হয়েছি,—সত্যিকার মা। এখন কার সাধ্যি মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে যায়!"

মহেন্দ্র মূঢ়ের মত শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে সারদার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অসীম ক্ষমার আধার নারী এইবার তাহার মহীয়সী মূর্ত্তিতে দেখা দিল। মাতৃত্বের বিরাট গাম্ভীর্য্য মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়া তাহার স্থানে ফুটিয়া উঠিল প্রেয়সীর পরিপূর্ণ অনুরাগের দীপ্তি। স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে সকল গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া সারদা বলিল—"অমন ক'রে চেয়ে দেখ্‌ছ কি? একে যে আমি চিনে ফেলেছি, আর ত ছাড়্‌ব না। এখন যাও, ওদের ফিরে যেতে বল।"

মহেন্দ্র স্খলিত-চরণে বাহির হইয়া গিয়া, মুখে একটু ম্লান হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"না, মেয়েরা দিতে চাইছে না।"

"বেশ ত, তা'র ওপর আর কি কথা আছে?"—বলিয়া তাহারা বিদায় লইল।

মহেন্দ্র একাকী দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিলেন। তারপর চোরের মত অতি সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিয়া, আন্‌লা হইতে জামা-চাদর পাড়িয়া লইয়া আবার তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

"বিচিত্রা"—আশ্বিন ১৩৪১

এক-তরফা

১

মানদার চক্ষে জল আসিল।

গুরুচরণ তাহাকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া চোখ মুছাইয়া দিল; বলিল—"কেঁদে ফেল্‌লি, পাগ্‌লী! তা' হ'লে কি ক'রে হ'বে বল্‌?……কিন্তু আর ত কোন উপায় নেই—টাকা আজই চাই যে।…এই তোর গা' ছুঁয়ে বল্‌ছি মান্থ, এবার পাট বেচে আগে এইটে শুধ্‌ব, তবে অন্য কথা। এনে দে, লক্ষ্মীটি।"

মানদা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"তোমাদের এই কাল মামলার কি শেষ নেই?"

"এই আজই শেষ। হাকিম আজ আর রাখ্‌বে না—হয় ইস্‌-পার, নয় উস্‌-পার, যা' হ'ক একটা নিষ্পত্তি হয়ে যা'বেই।"

"কিন্তু এতেই কি মিট্‌বে? আপীল আছে, আরও সব কি আছে—"

গুরুচরণ অধীর হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"তা'র এখন ঢের দেরী—সে কথা পরে ভাবা যা'বে। এখন আজকের দিনটা……। যা মান্থ, এখনি রওনা হ'তে হ'বে—আর সময় নেই।"

মানদা নিঃশব্দে দাওয়া হইতে ঘরে ঢুকিল।

২

ব্যাপার এমন কিছু নয়, এ হতভাগা দেশে প্রায় ঘরে-ঘরে যাহা ঘটিতেছে তাহাই—ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ, ভাইয়ে-ভাইয়ে মকদ্দমা।

গুরুচরণের বাপ যতদিন বাঁচিয়া ছিল, দু-ভাইয়ে এক-রকম মিলিয়া-মিশিয়া বাস করিতেছিল। কিন্তু ছোট সাধুচরণের স্ত্রী সুন্দরী এই নূতন সংসারে আসিয়া তেমন মিশ খাইল না। তাহার বাপ নানা উপায়ে বিস্তর জমি-জমা করিয়াছে, শেষে সুযোগ মত একটা তৌজির ক্ষুদ্র অংশ খরিদ করিয়া জমিদার হইয়া বসিয়াছে। আদালতের নথি এবং দলিল-পত্রে এত দিন তাহার পরিচয় লেখা হইত—'পেশা জমি-জমার উপসত্ব ভোগাদি', এইবার হইল—'পেশা জমিদারী'। এ হেন ভুঁইফোঁড় ভূম্যধিকারীর আদরিণী কন্যা যখন বিবাহের অনেক দিন পরে দয়া করিয়া শ্বশুর-বাড়ী 'ঘর করিতে' আসিল, তখন তাহার লম্বা-চৌড়া কথা এবং সদা-কুঞ্চিত নাসিকা দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা নানারূপ অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল।

বৃদ্ধ লঙ্কেশ্বর মান্নার বুঝিতে দেরী হইল না যে ঘর ভাঙ্গিবার যাবতীয় অস্ত্র এই ছোট্ট মেয়েটির করতলগত, এবং সে বেশ নিপুণ ভাবেই তাহার প্রয়োগ করিতে পারিবে। তাই বৃদ্ধ তাহার জীবদ্দশাতেই সমস্ত জমি-জমা দুই সমান অংশে ভাগ করিয়া ভবিষ্যৎ বিবাদের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সাধুচরণ তাহার শ্বশুরের সাহায্যে আপন অংশ বুঝিয়া লইল। কয়েক বৎসর বেশ গেল। শেষে একটা দেড় কাঠা

আন্দাজ কালি জমি লইয়া দুই ভাইয়ে বিবাদ বাধিল—এটুকু কাহার সীমানার ভিতর। গ্রামের মাতব্বরগণের মতে ইহা গুরুচরণের অংশের অন্তর্গতই বটে। কিন্তু সাধুর শ্বশুর বুঝাইয়া দিল—সাক্ষী গড়িয়া লইতে পারিলে ও দেড়-কাঠা কেন, সমস্ত পাঁচ-বিঘাটারই ডিক্রী পাওয়া যায়। একবার নালিশ করিলেই হয়।

সাধু প্রথমটা তেমন রাজী হয় নাই। কিন্তু এমন মহৎ কার্য্যে উৎসাহ দিবার লোক ঘরে-বাইরে যথেষ্ট ছিল; সুতরাং অবশেষে সাধুও নাচিয়া উঠিল। বৎসর খানেক হইল মকদ্দমা রুজু হইয়াছে, আজ বিচারের দিন,—উভয় পক্ষই প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে।

গুরুচরণের কিন্তু আজ টাকার সংস্থান নাই। মকদ্দমার খরচ চালাইবার জন্য সে প্রথমে কিছু জমি বিক্রয় বা বন্ধক রাখিবে মনস্থ করিয়াছিল। বাধা দিল মানদা। সে এতদিন নিজের অঙ্গ হইতে একখানি একখানি করিয়া সোনা-রূপার গহনা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া মকদ্দমার খরচ যোগাইয়াছে। আজ তাহার সব গিয়াছে, আছে কেবল হাতের শাঁখা এবং নোয়া।

অলঙ্কার নারীর বড় প্রিয় সামগ্রী। মানদা যদিও নিজে হইতে হাসিমুখে সব খুলিয়া দিয়াছে, তথাপি তাহার শোভাসম্পদহীন অঙ্গের প্রতি চাহিয়া এক এক সময় মন বিষণ্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই হাতের নোয়াগাছটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার সকল বিষাদ কাটিয়া যায়, ধীরে ধীরে হাতখানি তুলিয়া হিন্দু-নারীর এই শ্রেষ্ঠ সম্পদটিকে কপালে ঠেকাইয়া সুখের আবেশে তাহার চোখ বুজিয়া আসে।

টাকার কোন কিনারা করিতে না পারিয়া গুরুচরণ শেষে স্থির করিল, তাহার তিন বৎসরের মেয়ে শোভার গলায় যে বিছা হার আছে, তাহাই বন্ধক রাখিয়া টাকার যোগাড় করিবে। কথাটা গত রাত্রেই সে মানদাকে বলিয়াছে, কিন্তু মানদার মন তখন কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই। তাই আজ সকালে গুরুচরণ যখন সত্য সত্যই হার চাহিয়া বসিল, তখন মানদার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল।

৩

অতি সন্তর্পণে নিদ্রিত কন্যার গলা হইতে হার খুলিয়া লইয়া মানদা বাহির হইয়া আসিল। শোভা এখনই উঠিবে, তখন তাহার হার কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করিলে কি কৈফিয়ৎ দিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে হার ছড়াটি গুরুচরণের হাতে দিল।

হার লইয়াই গুরুচরণ চলিয়া যাইতেছিল। মানদা বলিল—"আচ্ছা, এ মকদ্দমা কি মেটবার উপায় নেই ?"

গুরুচরণ থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কি রকম ?,'

"ও দেড় কাঠা ফালিটুকু না হয় ছেড়েই দাও না। হাজার হ'ক নিজের ভাই ত বটে ! এর জন্যে দু-পক্ষের কত খরচ হ'ল বল দেখি ? তা'তে যে অমন কত দেড়-কাঠা হ'তে পার্‌ত। যা'ই হ'ক, এখন এস। কিন্তু মেয়ে-মানুষের কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করো না, নিজের মনে একটু ভেবে দেখো।"

গুরুচরণ কিছু বলিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

দ্রুতপদে কিছুদূর যাইয়া গুরুচরণ একখানা অতি পুরাতন পাকা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীখানি গ্রামের বামুন-পিসীর। এই পুণ্যশীলা বর্ষিয়সী রমণীটি তখন ঠাকুর-ঘরের দরজার পাশে রোয়াকে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন। সম্মুখের উঠানে পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া মুচিদের মেজ-বৌ।

সে আজ দুটি টাকা কর্জ্জ লইতে আসিয়াছে। এই টাকা লইয়া তাহার স্বামীকে চামড়া কিনিতে পাঠাইবে। দু'-জোড়া জুতার বায়না পাইয়াছিল সে, কিন্তু টাকাটা তাড়ি খাইয়া উড়াইয়া দিয়াছে। এদিকে খরিদ্দার তাগাদা আরম্ভ করিয়াছে।

মুচি-বৌ তাহার দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল; বামুন-পিসী নীরবে মালা ঘুরাইতেছিলেন। কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন—"তা টাকা দিতে পারি—অত ক'রে যখন বল্‌চিস। তোদের দুঃখের কথা শুন্‌লে সত্যিই মনে বড় কষ্ট হয়—থাক্‌তে পারি না। কিন্তু ওদিকে সুদ জমে যাচ্ছে যে, তা'র কি কর্‌চিস্? সুদ কত হ'ল বল্ দেখি।"

গুরুচরণকে আসিতে দেখিয়া মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া, মুচি-বৌ চাপা গলায় উত্তর করিল—"সে মোরা কি জানি, আপনারা ত হিসেব রাখ্‌চো—তা হ'লেই হ'ল।"

বামুন-পিসী কিছু বলিলেন না। তাঁহার হাতের মালা ঘুরিয়া চলিল, ঠোঁট দুখানি ঈষৎ নড়িতে লাগিল। মিনিট দুই পরে বলিলেন,—"সুদ হয়েচে তোদের চোদ্দ আনা, বুঝ্‌লি? আর এই দু'-টাকার সুদ চাপ্‌লেই টাকা পুরে যা'বে। বিপদে-আপদে দরকার হ'লে টাকা ত বরাবর দিয়ে আস্‌চি, আর তা'র জন্যে তেমন তাগাদাও করি না। কিন্তু সুদ

জ'মে গেলে যে তোদেরই মুস্কিল। এবার সুদের টাকাটা যা-হোক করে দিয়ে দিস্—বুঝ্লি ?"

মুচি-বৌ কি বলিল শোনা গেল না। বামুন-পিসী বলিলেন—"তা'র দরকার কি ? বরং এক কাজ কর,—দু'টাকা নয়, তুই তিন টাকা নে। আর তাই থেকে একটা টাকা সুদের দরুণ দিয়ে দে। তবু ত কতকটা হাল্কা হয়ে থাকে।"

তাহাই হইল। হরিনামের থলিটি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া বামুন-পিসী তিনটি টাকা আনিয়া তাহার হাতে আল্‌গোছে ফেলিয়া দিলেন, এবং তাহা হইতে সুদের দরুণ একটি টাকা রোয়াকের উপর রাখিয়া যাইতে বলিলেন।

মুচি-বৌ টাকাটি রাখিয়া চলিয়া গেল। টাকাটিতে গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া বামুন-পিসী তুলিয়া রাখিলেন। তাহার পর আবার ঝুলি লইয়া বসিলেন।

৪

গুরুচরণ এতক্ষণ রোয়াকের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার কোমর হইতে হার ছড়াটি বাহির করিয়া ঝুলাইয়া ধরিল; বলিল—"সেদিন যে টাকার কথা বলেছিলুম—এই হারটা রেখেই না হয় দিন্।"

হারটির দিকে চাহিতেই বামুন-পিসীর চক্ষে একটা ক্ষুধিত লোলুপ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। তাহার সহিত একটু স্নেহ-রস মিশাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা তুই ত বাছা মুচিদের জামাই ন'স্—ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? উঠে এসে বস্ না।"

গুরুচরণ আহ্লাদে গলিয়া গেল। একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া রোয়াকের ধারে উঠিয়া বসিল এবং হাত বাড়াইয়া হার ছড়াটি বামুন-পিসীর সম্মুখে রাখিয়া দিল। তিনি তাহা বাম হস্তের চেটোয় তুলিয়া লইয়া, তাহার গুরুত্ব পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ভরিটাকের কিছু ওপর হ'বে।"

গুরুচরণ বলিল—"পাকা দেড় ভরির হার—বছর দেড়েক হ'ল গড়িয়েছি।"

"তা এতদিনে কিছু ক্ষয়েছে ত—মরুক্-গে, সওয়া ভরিই না হয় ধর। তার পর বিক্রী কর্‌তে গেলে পান বাদ আছে, গালাইয়ের দরুণ কিছু মর্‌বে। শেষ পর্য্যন্ত ঐ এক ভরিই দাঁড়া'বে। তা পনেরো টাকা দিতে পারি—সত্যিকার গিনি যদি হয়।" তাহার পর নানা দিক হইতে হারটিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"না, গিনিই বটে।"

হাতযোড় করিয়া গুরুচরণ নিবেদন করিল যে অন্ততঃ কুড়ি টাকা না হইলে তাহার চলিবে না। তাহার হাতে কিছু আছে বটে, তথাপি দু-দশ টাকা বেশী সম্বল করিয়া রাখা ভাল। হয় ত সব টাকা খরচ না-ও হইতে পারে। যদি কিছু বাঁচে, আজই আসিয়া ফেরত দিয়া যাইবে ইত্যাদি।

বামুন-পিসীর হাতের মালা ঘুরিয়া যাইতেছিল—তিনি তাহার কথায় তেমন কান দেন নাই। অন্য দিক দিয়া কথাটা ভাবিয়া দেখিতেছিলেন। টাকাটা মারা যাইবে না—সে ভয় নাই। সুদটাও মাসে মাসে আদায় হইবে বলিয়াই মনে হয়। এ অবস্থায় পাঁচ টাকা বেশী দিলে সুদের পরিমাণটা কিছু বাড়ে,—তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি যেন একটু অনিচ্ছার সহিত কুড়িটা টাকা দিতেই সম্মত হইলেন এবং সুদের হারটা ধার্য্য করিয়া লইয়া বাক্স হইতে টাকা আনিয়া দিলেন।

টাকা হাতে লইয়া গুরুচরণ একটি একটি করিয়া গণিয়া লইল। দুই-একটা একটু সন্দেহজনক মনে হইল, কিন্তু বাজাইয়া দেখিবার সাহস হইল না। সে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, খারাপ টাকা যদি থাকে, উকিলের উপর দিয়াই না-হয় চালানো যাইবে—অনেকেই ত তা' করে!

গুরুচরণ একটু তফাৎ হইতে বামুন-পিসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তিনিও মালা-হাতে আশীর্ব্বাদ করিলেন—অদ্যকার যুদ্ধে সে জয়যুক্ত হউক।

৫

সাধুচরণ গোড়া হইতেই শ্বশুরের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ এবং উপদেশ পাইয়া আসিতেছে। মামলা-মকদ্দমায় লোকটির খুব মাথা। তা'ছাড়া অনেক উকিলের সঙ্গে তাহার আলাপ থাকায় অল্প খরচে তাঁহাদের পরামর্শ পাইয়া আসিতেছে। ফলে মকদ্দমাটি বেশ মজবুত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু একটা সাহায্য সে শ্বশুরের নিকট মোটেই পাইল না—আর্থিক সাহায্য। মকদ্দমার খরচ যোগাইবার জন্য সাধুর যখনই টাকার অনটন হইয়াছে, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হয় জমিদার মহাশয়ের কিস্তির সময় আসিয়া পড়ে, কিংবা কোন বড় মকদ্দমার জন্য মোটা টাকা খরচ হইয়া যায়—হাতে কিছু থাকে না। তবে, অল্প আয়াসে এবং অল্প সুদে যাহাতে টাকা কর্জ্জ

পাওয়া যায় তাহার চেষ্টায় শ্বশুর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাই ইতিমধ্যে দুইখানি বন্ধকী খত লিখিয়া দিয়া প্রয়োজন মত টাকার যোগাড় হইয়াছে।

আজ কিন্তু সাধু গুরুচরণের মতই নিঃসম্বল। তাহার উপর বিপদ এই যে তাহার শ্বশুর শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নিজে আসিয়া জামাতার মামলা চালাইবার ভার লইতে পারিতেছে না। সে যাহা হউক, এখন টাকার কি উপায় হয়?

সুন্দরীর অলঙ্কার প্রচুর আছে, তাহার কিছু পাইলে টাকার সহজেই যোগাড় হয়। সাধু ইঙ্গিতে-আভাষে তাহার মনোভাব জানাইয়াছে। কিন্তু সুন্দরী মুখ-ঝাম্‌টা দিয়া উঠিয়াছে—"তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে মকদ্দমা, তা'র আমি কি জানি? আমার গহনা দেব কি জন্যে? শুধু শুধু একটা দোষের ভাগী হওয়া,—লোকে বল্‌বে বৌটাই খরচা যুগিয়ে মকদ্দমা চালাচ্ছে। ও-সব হবে-টবে না, বলে দিচ্চি।"

অগত্যা আবার জমী বন্ধক রাখিতে হইতেছে। গ্রামেরই একজন— এ মকদ্দমায় সাধুর পক্ষের একজন সাক্ষীও সে—টাকা দিতে সম্মত হইয়াছে, আজই রেজিষ্ট্রী অফিসে গিয়া টাকার আদান-প্রদান হইবে।

সাধু এইবার মহোল্লাসে সাক্ষীবৃন্দ সহ রওনা হইল। দলপতি হইয়া চলিলেন বামুন-পাড়ার গাঙ্গুলী-মশায়। এই গাঙ্গুলী-মশায়টি অতি পরোপকারী ব্যক্তি। যখনই যাহার মামলা-ফ্যাসাদ বাধে, তিনি বুক দিয়া পড়িয়া সাহায্য করেন। এতদিন সাধুর শ্বশুর ছিল বলিয়া তাঁহাকে আবশ্যক হয় নাই, এখন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই সাধুর উপকার করিতে আসিলেন।

৬

সাক্ষীদের হাতে খোরাকীর পয়সা দিয়া গুরুচরণ উকিলের বাসায় গেল।

উকিলবাবু তখন চা পান করিয়া, গড়গড়ার নলে মুখ লাগাইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। কয়েকজন প্রতিবেশী প্রতিদিনের মত আড্ডা সরগরম করিয়া রাখিয়াছেন। দু-একজন মক্কেলও বেঞ্চে বসিয়া নীরবে উকিলবাবুর ফুরসতের অপেক্ষা করিতেছে।

গুরুচরণ আসিয়া প্রণাম করিল এবং টেবিলের উপর দুইটি টাকা রাখিয়া বেঞ্চে গিয়া বসিল।

উকিলবাবু বলিলেন—"ও কি হ'ল হে! আজ তোমার মকদ্দমা ধর্‌বে—আজ ও কি দিচ্ছ?"

"আজ্ঞে, ওটা কিছু নয়—বউনিই বলুন আর প্রণামীই বলুন—এখন ও-ই রাখুন। ফিয়ের টাকা আপনার কি কখনও বাকী রেখেছি?"

উকিলবাবু সহাস্য বদনে বলিলেন—"না, তুমি তেমন লোক নও—জানি। তোমার সাক্ষী-টাক্ষী সব এনেছ ত? সময় থাক্‌তে একবার মুহুরীর কাছে নিয়ে যেও তা'দের।"

তিনি আবার খবরের কাগজে মন দিলেন। গুরুচরণ বসিয়া নেকড়ায় বাঁধা কাগজ-পত্র বাহির করিয়া গুছাইতে লাগিল।

এমন সময়ে ভৃত্যের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উকিলবাবুর মেয়ে পুষ্প ঘরে প্রবেশ করিল। গুরুচরণ দেখিল মেয়েটি বয়সে তাহার শোভার মতই হইবে, তবে বর্ণ এবং আকৃতিতে বিস্তর প্রভেদ,—কেবল মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি এবং মুখের হাসিটি অনেকটা এক রকম।

পুষ্প আসিয়া তাহার পিতাকে ধরিয়া বসিল—রাস্তায় খেলনা ফেরি করিয়া যাইতেছে, তাহাই একটা কিনিয়া দিতে হইবে। পঞ্চাকে সে একধারে সাক্ষী এবং উকিল নিযুক্ত করিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিল।

পঞ্চা বুঝাইয়া দিল—"আজকাল যে নতুন নতুন আলুর খেলনা উঠেছে না—নানা রকম কল-কব্জা দেওয়া, পেঁচ দিলে পুতুলটা নাচে, লাফায়, ডিগ্‌বাজি খায়—সেই সব খেলনা।"

উকিলবাবু মুখ হইতে নল সারাইয়া গড়গড়ার গায়ে জড়াইয়া রাখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ডাক্‌, দেখি।"

ফেরিওয়ালা আসিয়া মোট খুলিয়া তিন-চার রকম খেলনা টেবিলের উপর সাজাইল এবং একটা একটা করিয়া স্প্রিংয়ে পেঁচ দিয়া দিল,—পুতুল-গুলা নাচিয়া, লাফাইয়া, দুলিয়া, নানারূপ খেলা করিতে লাগিল। পুষ্প পিতার কোলের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে নিজেও নাচিয়া উঠিতেছিল।

ইহার মধ্যে একটা বাঁদর ছিল, তাহার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী এবং কসরৎ দেখিয়া পুষ্প হাসিয়া অস্থির। বলিল—"ঐটাই চাই, বাবা।"

ফেরিওয়ালা বাকী খেলনাগুলি তুলিয়া ফেলিল এবং বাঁদরটার জন্য চৌদ্দ সিকা চাহিয়া বসিল। অনেক দর-কষাকষির পর শেষে দুই টাকায় রফা হইল এবং গুরুচরণের দেওয়া টাকা দুটি লইয়া কপালে ঠেকাইয়া ফেরিওয়ালা প্রস্থান করিল।

তাহার পর টেবিলের ঠিক মাঝখানে বাঁদরটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দম দেওয়া হইল। তাহার হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া উকিলবাবু বালকের

মত হাসিতে লাগিলেন, পুষ্প হাততালি দিয়া নাচিতে সুরু করিল। উপস্থিত সকলেই এই আমোদে যোগ দিল।

হাসিল না কেবল গুরুচরণ।

পুষ্পকে দেখিয়া তাহার শোভাকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল। ভাবিতেছিল শোভা অনেকক্ষণ উঠিয়াছে, গলায় হার নাই দেখিয়া হয় ত কত কাঁদিতেছে, কিংবা মায়ের উপর অত্যাচার করিতেছে। মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল।

তাহার পর তাহারই দেওয়া টাকা হু'টি দিয়া এই খেলনা কিনিতে দেখিয়া সে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করিল। সে তাহার ঘুমন্ত মেয়ের গলা হইতে চোরের মত হার খুলিয়া আনিয়া অনায়াসে তাহা বাঁধা রাখিয়া টাকা আনিল, আর সেই টাকায় আর একজন তাহার মেয়ের হাসিমুখ দেখিবার জন্য একটা বাঁদর কিনিয়া দিল! সেও ত সন্তানের পিতা, কিন্তু কি হীন, অধম, অযোগ্য পিতা সে!

বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে গুরুচরণের সংকল্প স্থির হইয়া গেল। কাগজ-পত্র গুটাইয়া বাঁধিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উকিলবাবু তাহাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন—"কি হে, কোথায় চল্‌লে?"

"আজ্ঞে, ততক্ষণ সাক্ষীগুলার······"

"আচ্ছা আচ্ছা, সেই ভাল কথা।" বলিয়া তিনি আবার বাঁদরের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

৭

গুরুচরণ কিন্তু সাক্ষীদের সন্ধানে গেল না—গেল রেজিষ্ট্রী অফিসে। দেখিল একটা বেলগাছের তলায় বসিয়া গাঙ্গুলী-মশায় হাত-মুখ নাড়িয়া সাধুকে কি যেন বুঝাইতেছেন, আর সাক্ষীগণ চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া মন দিয়া শুনিতেছে।

আর একটু কাছে যাইয়া গুরুচরণ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"সাধু, একট কথা বলি—শুনে যা।"

তাহাকে সহসা একাকী শত্রু-ব্যূহের এত নিকটে আসিতে দেখিয়া রথিবৃন্দ চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাধু একটু আগাইয়া আসিল।

গাঙ্গুলীকেও সাধুর সঙ্গে আসিতে দেখিয়া গুরুচরণ বলিল—"আপনাকে আর আস্‌তে হ'বে না—সাধুর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

দন্তহীন মুখখানিকে অসম্ভব রূপ বিকৃত করিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন—"এখন আবার ভাইয়ের সঙ্গে কি এমন গোপনীয় কথা আছে? ছেলেমানুষকে একলা পেয়ে ভোলাবি মনে করেচিস্? সে হ'বে না—যা বল্‌বার আমার সুমুখে বল্‌তে হ'বে।"

তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া গুরুচরণ বলিল—"সাধু, ও দেড়-কাঠাটার ওপর সত্যিই কি তোর বড্ড মন পড়েছে?—তা' হ'লে না হয় ছেড়েই দি।"

সাধু এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। গাঙ্গুলী তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—"ওঃ! ভাইয়ের ওপর ভালবাসাটা যে হঠাৎ উথ্‌লে উঠেছে দেখ্‌চি। সে হ'বে না—যা' হয় আদালত থেকেই হ'বে। তুই চ'লে আয় সাধু।"

৮

মকদ্দমার ডাক হইলে বাদী সাধুচরণ মান্না দলবল সহ আদালত-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিবাদী গুরুচরণের দেখা নাই। তাহার উকিল মকদ্দমার ডাক শুনিয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু আসিয়া দেখিলেন মক্কেল নাই। পেয়াদা আবার তিন ডাক দিল—তবু গুরুচরণ আসিল না।

তাহার উকিল বিস্মিত হইয়া গেলেন। লোকটা সকালে বাসায় আসিল—আর ঠিক এই সময়টিতেই কোথায় চলিয়া গেল সে? মুহুরীকে পাঠাইলেন মক্কেলকে খুঁজিয়া আনিতে।

মুহুরী অনেক খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিল এবং একপ্রকার জোর করিয়াই লইয়া আসিল।

ইতিমধ্যে সাধুর জবানবন্দী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

গুরুচরণ আসিতেই তাহার উকিল ধমক দিয়া উঠিলেন। কিন্তু সে বলিল, মকদ্দমা আর চালাইবে না সে। তখন উকিল এবং মুহুরীতে মিলিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা হইল। গুরুচরণ কোন কথাই বলিল না—নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হাকিমের সময় নষ্ট হইতেছিল, তিনি বলিলেন—"যাক্, তা' হ'লে এক-তর্ফাই হ'ক?"

গুরুচরণ হাত যোড় করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"হুজুর, ওটা এক-তর্ফা হওয়াই ঠিক।"

কথাটা হাকিম বুঝিলেন না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কি রকম!"

"হুজুর, আপনারাই বলে থাকেন, স্নেহ নিম্নগামী—নীচের দিকেই নামে, দো-তর্‌ফা বয় না। তাই বল্‌ছিলুম এটাও না হয় এক-তর্‌ফাই হ'ক। হাজার হ'ক সাধু ছোট ভাই ত,—ও যা'তে সুখী হয় তা'ই হ'ক।"

গুরুচরণ আর সেখানে দাঁড়াইল না, ধীরপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

এদিকে সাধু চীৎকার করিয়া উঠিল—"না দাদা, সে হ'বে না—এক-তর্‌ফা আমি হ'তে দিচ্চি না। দাঁড়াও আমিও যাচ্চি।"

কাঠগড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সে উন্মত্তের মত ভীড় ঠেলিয়া গিয়া গুরুচরণের পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া গেল।

৯

গ্রামে পৌছিয়া গুরুচরণ প্রথমেই বামুন-পিসীর বাড়ীতে গিয়া তাহার কর্জ্জ লওয়া কুড়িটি টাকা ফিরাইয়া দিল—তাহার সঙ্গে প্রণামী বলিয়া আর একটি টাকা। বামুন-পিসীর মনটা একটু অপ্রসন্ন হইয়া গেল, কিন্তু অতিরিক্ত টাকাটা পাইয়া তাহা আর প্রকাশ করিলেন না। টাকাগুলি তুলিয়া রাখিয়া তিনি হার ছড়াটা আনিয়া দিলেন।

গুরুচরণ যখন বাড়ী আসিয়া পৌছিল তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে—মানদা তুলসী-তলায় প্রদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেছে।

শোভা দাওয়ায় বসিয়া একটা কি খেলনা লইয়া এক মনে খেলা করিতেছিল। গুরুচরণ নিঃশব্দে তাহার পিছন দিক দিয়া যাইয়া গলায় হার পরাইয়া দিল। শোভা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওমা, এই দেখ্‌ হার—বাবা চুরি করেছিল। কি দুষ্টু বাবাটা!"

মানদা অসিয়া দেখিল সত্য সত্যই শোভার গলায় হার। মহা বিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল, ওটা ফিরে এল যে?"

"হার বাঁধা রেখে যে টাকা নিয়েছিলুম তা' ফিরিয়ে দিয়ে, এটা এই নিয়ে আস্‌চি।"

মানদা তখনও বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া আছে দেখিয়া গুরুচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"টাকার আর দরকার হয়নি। মেয়ে-মানুষের কথাই শেষে ফলে গিয়েছে—দেড়-কাঠাটা সাধুকে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে এসেছি!"

"সত্যি বল্‌চো?"

"তোর কাছে কখনও মিথ্যা বলেচি, মানু?"

মানদার গলায় তখনও আঁচল জড়ানো ছিল, সে তৎক্ষণাৎ গুরুচরণের পায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

আজ সকালেই গুরুচরণ মানদার চক্ষে জল দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিল। কিন্তু গোধূলির এই পুণ্যক্ষণে মানদার চক্ষে যে ধারা বহিয়াছে তাহা যে কত পবিত্র আনন্দের উৎস, এবং হৃদয়ের কোন্ গভীর কন্দরে তাহার উৎপত্তি, গুরুচরণ তাহা বুঝিল। তাই সে আর মানদাকে ধরিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা করিল না—স্থির, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মানদার চক্ষের জলে তাহার পা দু'খানি ভাসিয়া গেল।

"ভারতবর্ষ"—পৌষ, ১৩৩৯।

সন্ধি বিচ্ছেদ

আর্য্য-সন্তানের পক্ষে শাস্ত্রের বচন মনে রেখে চলা যে কত দরকার, তা' আমরা আজকাল ভুলে যেতে বসেছি। ছেলেবেলায়—মনে পড়ে—ছিদাম কামারের দোকানে সন্ধ্যার পর যখন ধূমপান-সভার অধিবেশন হ'ত, তখন যতবড় তর্কই উঠুক্ না কেন, একজন একটা শাস্ত্রের বচন আওড়া'তে পার্‌লেই সঙ্গে সঙ্গে তা'র চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। শ্লোকটা ঠিক জানা না থাক্‌লেও কেউ যদি বল্‌লে, "তুমি কি বল্‌ছ বাগের পো, সেটি হ'বার জো নেই, ওকথা শাস্তরে খুলে নিকে রেখে গেছে; পেত্যয় না হয় তৈলোক্য ঠাকুরকে জিজ্ঞেস্ করগে,"—অমনি সব সংশয় দূর হয়ে যেত। আর আজকাল? দু'পাতা ইংরাজী প'ড়ে আমরা—

না, আর নয়! এ যেন ক্রমে সনাতন-ধর্ম্ম-সংরক্ষিণী সমিতির বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারুর ভাল-লাগ্‌ছে না। থাক্, সে তখন পরে এক সময়ে বল্‌ব। এখন আসল কথা—অর্থাৎ একটা বাজে গল্প—বলি। কারণ এ কালে বাজেই আসল ব'লে গণ্য, মেকী খাঁটিকে হটিয়ে দিচ্চে।

একবার একটা দম্পতি-কলহ মেটাতে গিয়ে শেষে যা' দাঁড়া'ল, তা' দেখে মনে পড়্‌ল শাস্ত্রের বচন—'দম্পতি-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' কথাটা যদি ছাই আগে মনে পড়্‌ত তা' হ'লে কি ও কাজে হাত দি'!

ব্যাপারটা হয়েছিল আমাদের গাঁয়ের গোপাল চাটুয্যেকে নিয়ে। সে আমার ছেলেবেলাকার খেলার সাথি, পাঠশালা থেকে আরম্ভ ক'রে মাইনর স্কুলের কিছুদূর পর্য্যন্ত সহপাঠীও ছিল। আমার চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট হ'লেও, তা'র বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব (গাত্রবর্ণের নয়), বেশীদিন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করা চলেনি। তাই এখন তা'কে গোপাল-দা' ব'লে ডাকি। তবু দা'-ঠাকুর বল্‌তে কেমন একটু বাধে,—ঐ যে দু'-পাতা ইংরাজী পড়েছি কিনা।

বুড়ো মা ছাড়া গোপালের আপনার বল্‌বার কেউ ছিল না। এক তা'র দিদি অন্নদা,—কিন্তু তিনি অনেকদিন হ'ল গোত্রান্তর গ্রহণ ক'রে শুধু যে মায়া কাটিয়ে গিয়েছেন তাই নয়, এক বিশাল সংসারে অন্নদা-মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, কালে-ভদ্রে কখন বাপের বাড়ী এলে দু'চার দিনের বেশী থাক্‌তে পারেন না।

এ অবস্থায় ছেলের বিবাহ দেবার জন্যে মায়ের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ছেলের পক্ষেও সেটা আর কিছু না হ'ক অন্ততঃ কর্ত্তব্য ত বটেই। কিন্তু গোপাল কিছুতেই ঘাড় পাতে না! অভাব তা'র কিছুই ছিল না; জমি-জমা, বাগান পুকুরের ফসলে সংসার বেশ চ'লে যায়,—খেটে খা'বার দরকার হয় না। খুচরা তেজারতি ক'রে কিছু নগদ আমদানিও হয়। কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি কর্‌লে সে মাকে বল্‌ত, "কেন আমরা মায়ে-ব্যাটায় ত বেশ আছি মা। কি দরকার একটা ভেজাল ঢুকিয়ে।"

মা বলেন, "সে কি কথা! ঘরের লক্ষ্মী আস্‌বে—"

"হ্যাঁ, অমন লক্ষ্মী ত গাঁয়ের ঘরে-ঘরে দেখ্‌ছি! রক্ষা কর, দরকার নেই, এ বেশ আছি।"

মা হয় ত অভিমান ক'রে বলেন, "তা বেশ থাকৃবে বই কি বাবা! বুড়ো মা মরৃতে মরৃতে দাসীবৃত্তি করুক, ভাত রাঁধুক, আর—"

গোপাল অমনি বাধা দিয়ে বলে, "কেন, ঘরের পাট ত ফ্যালার মা সবই করৃচে। আর ভাত রাঁধা? ভারি ত! সে আমিও কি পারি না— বামুনের ছেলে।"

ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করৃবার জন্যে গোপাল দুদিন জোর ক'রে রান্না করৃল। কিন্তু মা হয়ে কেউ কি আর সত্যি ব'সে ব'সে তাই দেখ্‌তে পারে? দু'দিন পরে আবার যেমন ছিল তেমনি চলৃতে লাগল। গোপালের দাবা-পাশা আর গান-বাজনা নিয়ে বেশ দিন কেটে চলৃল। এই রকম ক'রে বছরের পর বছর গেল, গোপালের খেয়াল ছিল না যে 'বল-বুদ্ধি-ভরসা' যখন 'ফরৃসা' হয়ে যায় সে বয়সটা ক্রমেই এগিয়ে আসৃছে।

এমন সময়ে গোপালের মা গেলেন মারা। অন্ন-দিদি তা'র দু'-চার দিন আগেই খবর পেয়ে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু এবারও বেশীদিন থাকৃতে পারৃলেন না। চতুর্থীটা নিজের বাড়ীতে গিয়ে বেশ ঘটা ক'রেই করৃলেন।

এদিকে গোপালের স্বপাক চলৃতে লাগ্‌ল। কালাশৌচের একটা বছর এই রকম ক'রেই কাটৃল। ইতিমধ্যে দাদার মতিগতি বোধ হয় যেন একটু বদ্‌লাতে আরম্ভ করেছিল। কেন না এখন তাকে কেউ বিয়ের কথা বল্‌লে, সলজ্জ হাসির সঙ্গে একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলেই চুপ ক'রে যায়। বলে, এ বয়সে কে আর আমাকে মেয়ে দেবে বল। সম্মতি-লক্ষণটা বেশ স্পষ্ট নয় ব'লেই হ'ক, বা যে কারণেই হ'ক, কথাটা রহস্যচ্ছলে উঠে ঐ হাসি-

টুকুতেই তা'র পরিসমাপ্তি হয়। বিশেষ কোনও চেষ্টা আর হয় না, কারণ তেমন আগ্রহ কারুরই দেখা গেল না। হ'ত, যদি গ্রামে কারুর বয়স্থা কন্যা থাক্‌ত। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণের বাস বড় কম—মাত্র পাঁচ-সাত ঘর।

হঠাৎ একদিন গোপাল চ'লে গেল দিদির বাড়ী। তাঁর দেওরের এক ছেলের নাকি বিয়ে, তাই গোপালকে ডেকেছেন বিয়ে-বাড়ীতে খাট্‌বার জন্যে। কিন্তু গোপাল যে কেমন কাজের লোক তা' কি তা'র দিদির জানা নেই? ভাব্‌লাম মা-মরা-ভাইটির উপর বোধ হয় তাঁর স্নেহের মাত্রাটা একটু বেড়ে গিয়েছে, তাই এই সূত্রে তা'কে দিনকতক নিজের কাছে রাখ্‌বার ইচ্ছা।

মাস দুই পরে গোপাল ফিরে এল—সস্ত্রীক!

দিদি নাকি দেবর-পুত্রের সঙ্গে নিজের ভাইটিকেও বিবাহ-বিপণিতে যাচাই কর্‌তে দিয়েছিলেন। খরিদ্দার সহজেই জুটে গেল। তাই 'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন' গোপালদা'রও 'তীর্থ-দরশন' ঘ'টে গেল—বিনা খরচায়।

এই ঘটনায় গ্রামের একঘেয়ে জীবনে বেশ একটু মৃদু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। অপ্রত্যাশিত অথচ নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় নয় এমন কিছু ঘট্‌লেই এ রকম হয়ে থাকে।

এদিকে পত্নীলাভের সঙ্গে সঙ্গে গোপালের মিত্রলাভের যোগটাও বেশ দেখা গেল। যা'দের সঙ্গে কোন কালে ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তা'রাও খুব মাখামাখি আরম্ভ কর্‌ল। এমন কি, বয়সে দু'চার বছরের বড় এমনও কেউ কেউ 'গোপাল-দা' ব'লে তা'র সদর-ঘরে শিকড় গেড়ে বসেন, সহজে নড়্‌তে চান না।

গোপাল বুঝ্‌তে পারে না, হঠাৎ তা'র এতটা আদর-সম্ভ্রম বেড়ে গেল কেন। আমি বুঝিয়ে বল্‌লাম, "এ আর কিছু নয় দাদা, সেই যে 'কথামালায়' পড়েছিলে 'একদা এক দোকানে মধুর কলসী উল্‌টাইয়া পড়িল', আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে জুট্‌ল—এও তাই। তবে এ সব মাছি একটু বেশী সেয়ানা কি না, তাই মধুর কলসী ওল্‌টাবার অপেক্ষা রাখেনি, কলসী আমদানী হ'তেই আগে-ভাগে এসে জুটেছে,—ক্রমে সব স'রে পড়্‌বে।"

হ'লও তাই। কেবল আমার সঙ্গে গোপালের সম্বন্ধ সেই রকমই রইল, বরং আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। কারণ ক্রমে বৌদি'—অর্থাৎ গোপালের স্ত্রীর—সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল। ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁ'র সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের দ্বারা সহজেই আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্‌লেন।

কিন্তু মেয়েমানুষ জাতটা কি চালাক! তরুণী ভার্য্যার যে মূল্য কত, আর স্বামীর বয়সের অনুপাতে সেই মূল্যের যে কতটা তারতম্য হয়, তা' এই সরলা পল্লী-বালাও বেশ বুঝে নিয়েছেন। তাই দেখ্‌লাম ইনিও স্বামীর উপর তাঁ'র প্রতিপত্তি অল্পদিনের মধ্যে বেশ জমিয়ে বসেছেন। দেখ্‌লাম তাঁ'র একটা না একটা আব্‌দার লেগেই আছে,—আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই। অবশ্য, জড়োয়া গহনা কিংবা মোতির মালার ফরমাস নয়,—ছোটখাটো মামুলী, ন্যায়সঙ্গত ফরমাস। গোপাল তাঁ'র সকল আব্‌দারই অকুণ্ঠিত চিত্তে রক্ষা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ক'রেও সব সময়ে মন পায় না। জিনিষ প্রায়ই অপছন্দ হয়।

সেটা অবশ্য গোপালের দোষ নয়। স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য জিনিষের সঙ্গে এতদিন তা'র কোন পরিচয়ই ছিল না। কাজেই নিতান্ত আনাড়ির

মতন এটা-ওটা যা' কিনে আনে তা' কোনটাই প্রায় ঠিক হয় না। গোপাল শেষে ও ভারটা আমার উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এ কাজে আমার অভিজ্ঞতা গোপালের চেয়ে বেশী ত বটেই। তা'ছাড়া মামলা-মকদ্দমার জন্য প্রায়ই সহরে যেতে হয় ব'লে গ্রামশুদ্ধ লোকের ফরমাস প্রায় আমাকেই যোগা'তে হয়।

এই সূত্রে বৌদিদির সঙ্গে আমার বেশ একটা স্নেহের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল। তারপর, তাঁর আব্‌দার-অনুরোধের অন্ত নেই, আমারও তাঁ'র মন যোগা'তে ক্লান্তি নেই, গোপালের পয়সা যোগা'তে আপত্তি নেই। শেষে আমারই এক এক সময়ে বিরক্তি ধ'রে যায়। গোপালকে সতর্ক ক'রে দি', "অমন করে—একেবারে রাশ ছেড়ে দিয়ে ভাল কর্‌ছ না দাদা। বেশী 'নাই' দিলে শেষে সাম্‌লাতে পার্‌বে না। মাঝে মাঝে একটু রাশ টেনে ধর—না হলে স্ত্রৈণ হয়ে পড়্‌লে ব'লে। দেরী ক'রে বিয়ে কর্‌লে ওরকম প্রায়ই হয় বটে, কিন্তু তুমি ত সত্যি বুড়োও নও, দোজ্‌বরেও নও, অত নীচু হ'য়ে থাক্‌বে কেন? নিজের জোরের উপর থাক্‌বে,—'এই গোঁপ-জোড়াতে দিলে চাড়া'—এই রকম ভাব।"

মনে হয় উপদেশ রক্ষিত হয়েছে। কারণ বাইরে থেকে যতটা বুঝি, মাঝে মাঝে মান-অভিমান তর্কাতর্কির প্রমাণ পাওয়া যায়। এক একদিন গিয়ে দেখি, দাদা ঘোরতর গম্ভীর এবং যৎপরোনাস্তি চুপচাপ; আর বাড়ীর ভিতর গৃহিণীর মুখ ভার, যেন এইমাত্র একটা ঝড় হয়ে গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি।

জেলা-আদালতে আমার একটা বন্ধকী খতের মামলা দায়ের ছিল। একদিন পেয়াদা এসে হাজির হ'ল—আমার তরফের সাক্ষীদের সমন জারি করতে। গোপালও খতের একজন সাক্ষী ছিল। প্রথমেই তা'র সমনটি ধরিয়ে, পেয়াদাকে নিয়ে অন্য সাক্ষীদের তল্লাসে গেলাম। কাজ সারা হ'লে পেয়াদাকে খুসী ক'রে বিদায় দিয়ে ফিরছি, গোপালদের বাড়ীর সাম্‌নে এসে পৌছাতেই বাড়ীর ভিতরে উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

গোপাল-গৃহিণী তখন বেশ উঁচু গলায় মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করছেন, "তা' ব'লে আমার দাদাদের নিয়ে অমন ঠাট্টা-তামাসা করো' না, আমার ভাল লাগে না।"

দাদা জবাব দিচ্ছেন, "কেন করব না, খুব করব। আমার বল্‌বার অধিকার আছে ব'লেই বলি।"

একটা খণ্ড-যুদ্ধ চল্‌ছে দেখে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে হ'ল।

"কি হচ্ছে বৌদি', এমন প্রাণখোলা আলাপ আরম্ভ হয়ে গেছে যে? ও-পাড়া থেকে শুন্‌তে পেয়ে এই আস্‌ছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?"

কণ্ঠস্বর একটু সংযত ক'রে তিনি বল্‌লেন, "দেখ না ঠাকুর-পো, শুধু শুধু যখন তখন আমার দাদাদের ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কত কথা বলা হয়। কেন? কিসের জন্যে?"

আমি বল্‌লাম, "সে কথা ত বাড়ী ঢোক্‌বার আগেই শুনেছি। কিন্তু গোড়ার কথাটা কি? খামকাই কি আর তোমার দাদাদের—"

গোপাল বল্‌লে, "সে এক সামান্য তুচ্ছ কথা। তাই থেকে—"

"হ্যাঁ, তুচ্ছ কথা বই কি! আমি যা' বলি সবই তুচ্ছ কথা!"

বল্‌লাম, "বেশ ত, তুমিই বল না বৌদি' কি হয়েছিল।"

তিনি বেশ ধীর ভাবে গুছিয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, "হয়েছিল কি, আমি শুধু বলেছি, সাক্ষী দিতে সহরে যা'বে, সেই সময়ে আমার জন্যে একটা ব্লাউজ্ কিনে নিয়ে এস। এই না শুনে উনি একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লেন,—ব্লাউজ্ আবার কি? আমি বল্‌লাম, তা'ও জান না? —মেয়েদের গায়ে দেবার জামা। উনি বল্‌লেন, তাই বল—জ্যাকেট্। তা জ্যাকেট্ ত তোমার ক'টা রয়েছে। আমি বল্‌লাম, জ্যাকেট্ আজকাল ছোটলোকেরা পরে, ভদ্র-সমাজে চলে না,—ব্লাউজই ফ্যাসন। এই না শুনে উনি ত মহা গরম। বল্‌লেন, ওসব ফ্যাসন-ট্যাসন আমার বাড়ী চল্‌বে না। তোমার দাদারা সাহেবী মেজাজের লোক, বৌদিদিরা সব স্কুলে প'ড়ে মেমসাহেব ব'নে গেছেন, তাঁরা ব্লাউজ্-ঘাঘরা পর্‌তে পারেন—"

গোপাল বাধা দিয়ে বল্‌ল, "কথাটা আমি ঠিক ও ভাবে বলিনি। আমি বলেছিলাম, তোমার দাদারা থাকেন সহরে, কত বড় বড় ঘরে যাওয়া-আসা কর্‌তে হয় বৌদিদিদের, তাঁ'দের পক্ষে ফ্যাসান-মত নতুন নতুন ধরণের জামা-কাপড় দরকার হ'তে পারে ; এখানে এই পাড়াগাঁয়ে,—বামুনের ঘরের বৌ তুমি, তুমি ও সব কখনই বা পর্‌বে, আর প'রে কোথায়ই বা যা'বে? সেই কথাটাকে ঘুরিয়ে—"

আমি বল্‌লাম, "থাক গে, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। ব্যাপার কি তা' বুঝ্‌তে পেরেছি। এতে কিন্তু তোমাদের দুজনকারই দোষ আছে। তুমি ত দাদা, পৃথিবীর কোন খবরই রাখ না। বাস্তবিকই আজকাল জ্যাকেট্ আর চলে না, ব্লাউজ্ পরাই চাল। সুতরাং বৌদি' কিছু অন্যায় বলেননি। আর ওটা ত কিছু অষ্টপ্রহর ব্যবহারের জন্যে

নয়, তবে দুটো-একটা ভাল জামা-কাপড় ঘর ক'রে রাখা দরকার, কালে-ভদ্রে কোথাও যেতে আস্‌তে হ'লে—"

নিজের অনুকূলে ডিক্রী পাচ্ছেন দেখে বৌদি'র যেন একটু উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে তাঁর প্রধান অভিযোগের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ করলেন—"আর অমন যখন-তখন আমার দাদাদের বেখ্যানা করা,—তাঁ'রা হ্যান্ করেছেন, তাঁ'রা ত্যান্ করেছেন। তাঁ'দের কাছে থেকে, তাঁ'দের খেয়ে মানুষ হয়েছি,—আমার ওসব মোটেই সহ্য হয় না—" বল্‌তে বল্‌তে তাঁ'র স্বর বন্ধ হয়ে এল ; নারী ও শিশুর যা ব্রহ্মাস্ত্র, এই তালে তা'র প্রয়োগ আরম্ভ হ'ল।

পরনারীর চোখের জলে বিচলিত হ'বার মতন দুর্ব্বলতা আমার নাই। বল্‌লাম, "ওটা কিন্তু তোমার ভুল বৌদি'। তোমার দাদারা কি কেবল তোমারই দাদা, গোপালদা'র কি কেউ হন না? কি, বল না দাদা, তাঁ'রা তোমার কে হন?"

দাদা আমার চোখের ইঙ্গিত বুঝ্‌তে পারলেন। বল্‌লেন, "তাঁরা আমার শালা। শালাদের নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করব না? আলবৎ করব।"

দাদার কথায় সায় দিয়ে বল্‌লাম, "তা' তুমি খুব পার। কিন্তু তা' ব'লে যা'তে বৌদি'র মনে কষ্ট হয় এমন কোন কথা বলা উচিত নয়।"

ব্যাপারটাকে একটু হাল্কা ক'রে আনবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু তা' হ'ল না। বৌদি'র মুখের উপর থেকে মেঘখানা সরল না। তিনি আবার আরম্ভ করলেন,—"না, উনি আঁতে ঘা দিয়ে এমন এক-একটা কথা বলেন

যা'তে গা জলে যায়। এক এক সময়ে মনে হয় আমার যদি নিজের বাপের-বাড়ী থাকৃত, এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে জ্বালা জুড়াতাম। কিন্তু আমার-বাড়ীর উপর ত কোন দাবী নেই। যাই হ'ক, তুমি এর একটা বিহিত কর ঠাকুর-পো, আমি আর পারি না।"

আমি বল্লাম, "বাপের বাড়ী নেই ব'লে আপশোষ কর্ছ বৌদি' ? আচ্ছা বেশ, আমি এমন ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি যা'তে সেই একই ফল হ'বে। তোমরা নিত্যি এমন ছেলেমানুষের মতন ঝগড়া-ঝাটি আরম্ভ করেছ যে তা'র একটা মীমাংসা না ক'রে দিলে আর চল্‌ছে না। তাই আমি মধ্যস্থ হয়ে তোমাদের এই সর্ত্তে সন্ধি ক'রে দিচ্ছি যে, আজ থেকে কেউ কারুর সঙ্গে কথা কইবে না; আর জেঠাই-মার (গোপালের মার) ঘরখানা ত এখন খালি প'ড়ে রয়েছে, বৌদি' সেই ঘরে শোবে,—কারুর সঙ্গে কারুর সংস্রব থাক্‌বে না। তা' ব'লে বৌদি'কে রেঁধে ভাত দিতেও হ'বে, তেল-গামছাও জোগা'তে হ'বে, পানও সেজে দিতে হ'বে; আর দাদাকে দোকান-বাজার সবই ক'রে দিতে হ'বে,—কেবল কথা কইতে পা'বে না। আজ থেকে সাত দিন এই রকম চলুক। এই সাতদিন তু'জনকেই সন্ধির সর্ত্ত মেনে চল্‌তে হ'বে। যদি কেউ সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তা'র দণ্ড হ'বে। সাতদিন পরে আবার নতুন ব্যবস্থা হ'বে। কেমন, রাজী ত?" বৌদিদি মাথা হেঁট ক'রে বল্লেন, "বেশ, তাই হ'ক।" দাদার দিকে চাইতে তিনি শুধু একটু মুচ্‌কে হেসে চুপ ক'রে রইলেন। সুতরাং—'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্'।

তারপর মকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌বার জন্যে দাদাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সদর-ঘরে গিয়ে বসা গেল। সেখান থেকে বোঝা গেল যে বৌদিদি

তাঁ'র শ্বাশুড়ীর ঘরখানিকে ঝেড়ে-মুছে বাসোপযোগী কর্‌বার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগে গিয়েছেন।

দিন দুই পরে একবার খবর নিতে গেলাম। দেখা গেল আমার ব্যবস্থা মতই সব চল্‌ছে। কিন্তু দুজনকারই কেমন একটু ভাবান্তর লক্ষ্য কর্‌লাম। গোপালকে দেখে মনে হ'ল যেন একটু বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। ওদিকে বৌদিদির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য,—আমাকে দেখে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে দু'-চারটে মামুলি কথা কইলেন মাত্র, তারপর একেবারে চুপচাপ। বোধ হ'ল যেন আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট।

মনে মনে একটু রাগ হ'ল। দু'জনে খেচাখেচি ক'রে অশান্তি ভোগ কর্‌ছিল, আমি দিলাম মিটিয়ে,—এখন দু'জনে আমার উপরই বিরূপ ! হা অদৃষ্ট!

ঘটনার পর চারদিনের দিন আমার সেই মকদ্দমার তারিখ। একটু সকাল ক'রে বেরিয়ে পড়'তে হ'বে, না হ'লে ঠিক সময়ে পৌছাতে পারা যা'বে না। এই ভেবে ভোরে উঠেই সাক্ষীদের ডাক্‌তে ছুট লাম। ফের্‌বার পথে ভাব্‌লাম গোপালকেও একবার তাগাদা দিয়ে যাই।

সদর-দরজা খোলাই ছিল, গলা খাঁকারি দিয়ে ভিতরে ঢুক্‌লাম। দেখ্‌লাম রান্নাঘরের চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া উঠ্‌ছে,—মনে হ'ল এইমাত্র উনানে আগুন দেওয়া হয়েছে। ফ্যালার মা খিড়কীর ঘাটে বাসন মাজ্‌তে ব'সে কোন অনুপস্থিত প্রতিবেশিনীর উদ্দেশে অবাধে গাল দিয়ে চলেছে। বৌদিদি নিজের ঘরে শিকল তুলে দিয়ে বোধ করি পুকুরে গিয়েছেন।

দাদার ঘরের দরজা অল্প একটু ফাঁক করা রয়েছে দেখে, আমি রোয়াকের নীচে চটি খুলে রেখে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুক্‌তেই—একেবারে

চক্ষু স্থির! দেখি, দাদা সোজা হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, আর বৌদিদি তক্তপোষের ধারে পা ঝুলিয়ে ব'সে। বোধ করি হেঁট হয়ে দাদার কানে-কানে কিছু বল্‌ছিলেন, দরজা খোলার শব্দে চম্‌কে গিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়া'লেন। মুহূর্ত্তের জন্যে আমারও উমার মতন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা! পালা'বার পথ খুঁজ্‌ছি, এমন সময়ে দাদাও উঠে বস্‌লেন।

নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লাম, "দাদার কি শরীর খারাপ নাকি?'

দাদা উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁট গায়ে জড়'াতে জড়'াতে বল্‌লেন, "না' শরীর ভালই আছে।"

"তবে বৌদি' এ ঘরে কেন?"—এই বলে বৌদিদির মুখের পানে চাইতেই, তিনি মাথার কাপড় আর একটু টেনে দিয়ে শুধু একটু ক্ষীণ হাসি হাস্‌লেন। মনে হয় শাড়ীর লাল পাড়টার আভা প'ড়ে তাঁ'র মুখ-খানাকে অতখানি লাল ক'রে তুলেছিল।

আমি একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বল্‌লাম, "এই তোমাদের এত ঝগড়া-ঝাটি লাঠালাঠি, আমি থেকে ছু'জনের একটা সন্ধি ক'রে দিলাম, তুদিন যেতে না যেতেই সেই সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ! নিতান্ত ছেলেমানুষ সব।"

গোপাল-দা' আর একটু এগিয়ে এসে হেসে বল্‌লেন, "এটা নেহাৎ একটা সন্ধির সর্ত্তভঙ্গ নয় হে ভায়া,—এ একেবারে সন্ধি বিচ্ছেদ!" কাগজ ছেঁড়্‌বার ভঙ্গীতে ছু'হাত নেড়ে কথাটা তিনি বিশদ ক'রে দিলেন।

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বল্‌লাম, "তা হ'বে বই কি। আমারই ভুল হয়েছিল। দাম্পত্য-কলহে যে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই, এ কথাটা মনেই ছিল না। তা হ'লে আর এ বিড়ম্বনা হয়!"

"বিচিত্রা"—বৈশাখ, ১৩৪২

কাবুলী অবলা

না! গোপালদের নিয়ে আর পারা গেল না। নিত্যই তা'দের দাম্পত্য কলহ লেগে আছে, আর আমাকে নিত্যই ছুট্‌তে হয় তা'র সালিশী কর্‌তে। সে এক মহা বিড়ম্বনা!

এই সেদিন আবার কি কাণ্ড হ'ল বলি।

সেদিন সকালে—নিতান্ত সকালে নয়, তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে—দড়ি-কাটারি নিয়ে বাগানের বেড়াটা একটু মেরামত কর্‌ছি, হঠাৎ দেখি গোপাল এসে দাঁড়া'ল। বাজারে যা'বার সময় সে এক একদিন আমার এখানে হয়ে যায় বটে, কিন্তু সে দিন তা'র বাজারে যা'বার লক্ষণ নয়,—হাতে এস্‌রাজ!

তা'কে দেখে নীলকমলের কথা মনে প'ড়ে গেল। কি একটা রহস্য কর্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা'র মুখ দেখে থম্‌কে গেলাম। মনে হ'ল যেন রাগ, দুঃখ, লজ্জা, অভিমান ইত্যাদির সমন্বয়ে তা'র মুখখানা এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে।

সবিস্ময়ে বল্‌লাম—"কি ব্যাপার?"

গোপাল বল্‌লে—"আর কেন বল ভাই, বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে কি দুর্ব্বুদ্ধির কাজই করেছি! এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চল্‌ছে আর কি।"

"কেন, আজ আবার কি হ'ল? তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?"

"প্রায় তা'ই। আজ সকাল থেকেই মার-মূর্ত্তি। সদর-ঘর পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে এসে, এস্‌রাজের ছড়িটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পট্‌ ক'রে ভেঙ্গে ফেল্‌লে—একেবারে দু'খানা ক'রে। রাগের মাথায় যদি আবার এস্‌রাজটাও ভেঙ্গে বসে, তাই এটা হাতে ক'রে বেরিয়ে এলাম।"

"বেশ করেছ! এ রণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনই ত বুদ্ধিমানের কার্য।...... সে যাক্‌, চা খাওয়া হয়েছে ত?"

"তা' কই আর হ'ল! চায়ের পেয়ালা সুমুখে, খেতে যাচ্ছি,—এমন সময়ে এই বিভ্রাট। হয়েছিল কি—"

"আচ্ছা, সে গল্প পরে শোনা যা'বে। এখন চল, বস্‌বে চল। চাটা করতে ব'লে এসে তোমার কথা শুন্‌ছি।"

গোপাল বল্‌তে আরম্ভ করলে,—"হয়েছিল কি জান, সকালে এস্‌রাজটা নিয়ে একটু বাজা'তে বসেছি, এমন সময়ে চা নিয়ে এল। বল্‌লে—চট্‌ ক'রে চা খেয়ে নিয়ে একবার বাজারটা ঘুরে এস দেখি। আমি বল্‌লাম—কাল ত মেলা বাজার ক'রে এনেছি—। বল্‌লে—তরি-তরকারি সবই প্রায় আছে, কেবল মাছটা আন্‌তে হ'বে,—আজ আবার একাদশী কি না। বল্‌লাম—ও, আচ্ছা যা'ব। একটু পরে আবার এসে হাজির। বলে—কি হয়েছে আজ তোমার? চা জুড়িয়ে জল হয়ে

গেল, সেদিকে হুঁশ নেই ; একবার বাজার যেতে বল্‌লাম, তা'রও ত কোন গা দেখ্‌ছি না। সারাদিন ব'সে ব'সে কেবল কোঁকর-কোঁকর,— কান ঝালাপালা ! এতখানি বেলা হ'ল, বাজার কি তোমার জন্যে বসে থাক্‌বে ?—তারপর কি খানিকটা কথা কাটাকাটির পর, দিলে আমার এস্‌রাজের ছড়িটা ভেঙ্গে। তারপর—"

রান্নাঘরের দাওয়া থেকে টেঁপী হেঁকে বল্‌লে—"বাবা, চা হয়েছে,— নিয়ে যাও।"

চা এনে দিতে গোপাল বেশ তারিয়ে তারিয়ে চা খেতে লাগ্‌ল। আমি তখন গেলাম তামাকের যোগাড়ে।

রান্নাঘরে আগুন নিতে গেলাম, টেঁপীর মা বল্‌লে—"বাইরে কে এসেছে গো, গোপাল-ঠাকুর নয় ? তা আমাদের বাড়ী হঠাৎ চা খেতে এল যে,—বাড়ীতে জোটেনি বুঝি ?"

বল্‌লাম—"বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছে। আহা, বেচারীর কি বরাৎ বল দেখি ! ছেলে-পুলের বালাই নেই, বাড়ীতে একটা তৃতীয় লোক নেই, দুটিতে কপোত কপোতীর মতন কেমন থাক্‌বে, তা' নয়—"

টেঁপীর মা বল্‌লে—"হ্যাঁ, তা' বুঝি আবার হয়। বাঁঝা মেয়ে-মানুষেরই ঝাঁজ বেশী। ছেলে-পুলে হলে অতটা থাক্‌ত না।"

একটু দুষ্টামী ক'রে বল্‌লাম—"তা'ই বা বলি কি ক'রে ? তোর ওপর মা-ষষ্ঠীর কৃপা ত কিছু কম নয়, কিন্তু তোরও ত ও গুণে ঘাট নেই।"

টেঁপীর মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—"কথার ছিরি দেখ না ! আমি যেন অষ্টপ্রহরই ওঁর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছি, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

"তাড়িয়ে না দিস্‌, পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতে ত ছাড়িস্‌ না।"

"সে তুমি যখন-তখন রাগাও ব'লেই ত !"

একটু সোহাগের হাসি হেসে বল্লাম, "তা' বড় মিছে নয়। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোকে রাগা'তে আমার বড্ড ভাল লাগে। মনে আছে ত, যখন বিয়ে হ'ল তখন ত তোর ন' বছর বয়স। তখন ত আর ভালবাসা টালবাসা কিছু শিখিনি, তোর সঙ্গে খুনসুড়ি ক'রে তোকে ক্ষেপিয়ে বড় আমোদ হ'ত। সে অভ্যাসটা কি আর এখনও গেছে।"

এ কথার উপর টেঁপীর মা আবার কি বল্‌তে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি কল্‌কেতে আগুণ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—"এই রে! গোপাল ঠাকুরদের ছোঁয়াচটা শেষে আমাদের হেঁসেলে পর্য্যন্ত এসে পৌছল নাকি! এখন রেহাই দে, ঝগড়াটা উপস্থিত মুলতুবি থাক। এখন দেখি, লোকটাকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি,—আমার ত ওই কাজ।"

লোকটা ক্রমে অনেকটা ঠাণ্ডা হ'ল বটে, কিন্তু কিছুতেই বাড়ী যেতে চায় না। বলে—"না আমি এইখানেই প'ড়ে থাক্‌ব। চারটি চিড়ে ভিজিয়ে—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম,—"থাম, থাম, দেখি তা'র কি ব্যবস্থা হয়।"

মহা বিব্রত হয়ে ছুটে গেলাম টেঁপীর মার কাছে—আমার বুদ্ধির খাজাঞ্চী ত সে-ই! সে শুনে বল্লে—"তা'র জন্যে ভাবনা কি? রান্নাঘরের দাওয়ার উনানটাতে মাজা বক্‌নোয় ক'রে দু'টি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিলেই হ'বে। আর, একবার বাজারটা ঘুরে এস দেখি, যদি কিছু মাছ পাওয়া যায় ত ঝোল ঝাল একটা কিছু ক'রে নিতে পার্‌বেন

এখন।······আর শোন, ওখানে বামুনের মেয়ে একলাটি কি করছে তা'র ঠিক নেই, একটু খবর নেওয়া দরকার ত। পার ত কিছু মাছ ওদের বাড়ীও পাঠিয়ে দিও। ঐ মাছ নিয়েই ত দাঙ্গা বেধেছিল। আর সত্যিই, এয়স্ত্রী মানুষ, একাদশীর দিন মাছ-ভাত মুখে না দিলে যে সোয়ামীর অকল্যান হ'বে।"

আমি বল্‌লাম—"আর, যদি পাই তোর জন্যে আরো কিছু মাছ নিয়ে আসি,—আমার কল্যানের ব্যবস্থাটাও একটু ভাল ক'রে কর্।"

ডালের কাঠি নিয়ে সে তাড়া ক'রে এল;—"রকম দেখ না,—ইয়ার্কি করবার আর সময়-অসময় নেই।······যাও চট্ ক'রে।"

চট্ ক'রেই গেলাম। পয়সা টেঁকেই ছিল, গামছাও কাঁধে ছিল। গোপালকে ব'লে গেলাম—"একটু বস দাদা, এখনি আস্‌ছি।"

বাজারে কিন্তু অত বেলায় মাছ পাওয়া গেল না। শেষে ভুতো জেলের বাড়ী থেকে কই-মাছ কিনে আন্‌তে হ'ল। ভুতোর ছেলেকে দিয়ে গোপালের বাড়ীতেও কিছু পাঠিয়ে দিলাম। ব'লে দিলাম—"বল্‌বি, গোপাল-ঠাকুর কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি আর কিছু জিজ্ঞাস করে ত বল্‌বি, আমি জানি না।

•

ভাত বাড়্‌তে বাড়্‌তে গোপাল বল্‌লে—"একি হয়েছে? এত ভাত কি একটা লোকে খেতে পারে?"

আমি বল্‌লাম—"বুঝ্‌তে পারছ না—প্রসাদ পা'বার লোভে ইচ্ছে ক'রেই ও রকম বে-হিসাবী কাজ করা হয়েছে। জান ত হিন্দুনারীর মতি-গতি,—ঐ গো, ব্রাহ্মণ আর পতি।"

গোপাল বল্‌লে—"তবে কিনা, আজকাল পতি বেচারী ও দল থেকে খারিজ হ'বার যোগাড় হয়েছে।"

আমি বল্‌লাম—"সেটা বল্‌লে অন্যায় হয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, যত্ন—তিনটির উপরই সমান আছে,—বরং পতির উপরেই কিছু বেশী। ব্রাহ্মণকে অবশ্য চরা'তে হয় না, তিনিই মেয়েদের চরান; গরু চরা'বার ভার রাখালের; কিন্তু পতিতে সতী নিজেই চরান,—আর কারুর উপর সে ভার দিয়ে বিশ্বাস হয় না।"

আহারাদির পর দিবানিদ্রা ক'রে উঠলে, গোপালকে বেশ ক'রে এক ছিলিম তামাক সেজে দিলাম। দিয়ে বল্‌লাম—"তামাকটা খেয়ে নিয়ে চল, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি"

সে বল্‌লে—"না, বাড়ী আজ আর যা'ব না, রাত্তিরটা তোমার এই চণ্ডীমণ্ডপেই প'ড়ে থাকা যা'বে। আমার জন্যে ভাব্‌তে হ'বে না।"

বল্‌লাম—"তোমার জন্যে ত ভাবনা নয়। তুমি বাড়ী না গেলে সে বেচারী সেখানে একলাটি—"

"হ্যাঁ, অমন ধিঙ্গী মেয়ে-মানুষ, তার জন্যে আবার ভাবনা!"

মনে মনেই বললাম—আচ্ছা বেশ, বাড়ী যা'বার কথা আর আমি বল্‌ছিনে,—পুরুষের রাগ কতক্ষণ থাকে দেখা যাক্‌।

ক্রমে দু'-একজন ক'রে নিষ্কর্ম্মার দল এসে জুটল। দাবা, পাশা, তাস, পেড়ে সব বসা গেল।

তুমুল খেলার মাঝখানে একবার ঘাড় তুলে দেখি, ফ্যালার মা দোর-গোড়া থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। বললাম—"কি রে ফ্যালার মা, দা'-ঠাকুরকে খুঁজ্‌তে এসেছিস্‌?"

সে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে—"না, খুঁজ্‌তে নয়। বৌ-ঠা'ন বল্‌লে—"মানুষটা সারাদিন বাড়ী-ছাড়া হয়ে রয়েছে,—কোথায় গেল, কি কর্‌ছে, একবার দেখ্‌ত। বোধ করি আম-নোচনদের বাড়ীতে আছে. —ঐ মিন্সের সঙ্গেই বেশী ভাব কিনা।"

আমি বল্‌লাম—"তুই গিয়ে বল্‌, এই মিন্সের বাড়ীতেই আছে, ব'সে পাশা খেল্‌ছে।"

ফ্যালার মা চ'লে যাচ্ছিল, ডেকে তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"হাঁরে, বৌ-ঠা'ন কি কর্‌ছে ?"

সে বল্‌লে—"কি আবার কর্‌বে ? সারাদিন কেঁদে কুলুক্ষেত্র করেছে, কিছু খায়নি দায়নি—"

"তা' হ'লে তোর দা'-ঠাকুর চ'লে আসাতে বৌ-ঠা'ন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বল্‌।"

মুখ-বিকৃতি ক'রে ফ্যালার মা বল্‌লে—"হ্যাঁ, ঠাণ্ডা হয়েছে বৈ কি ! আমাকে যা'-নয়-তাই ব'লে যা বক্‌লে—খালি মার্‌তে বাকী রেখেছে !"

"কেন কি করেছিলি তুই ?"

সে ধীরে ধীরে দরজার পাশটিতে চেপে বস্‌ল। ব'সে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—"এই কি হয়েছিল জান বাবা, আমাকে তখন আটটা পয়হা দিয়ে বল্‌লে—ফ্যালার মা, এই পয়হা নিয়ে একবার বাজারে যা, ভাল মাছ যদি পাস্‌ ত কিছু নিয়ে আয়। তা বাবা, এই ছ' পয়হা দিয়ে এমন একটি মাছ নিয়ে গেলুম। সেই মাছ না দেখে, বামুণী যেন একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠ্‌ল গা ! বল্‌লে—ফ্যালার মা, বুড়ো হয়ে তোর ভীমরতি ধরেছে। তুই শোল-মাছ নিয়ে এলি কোন আক্কেলে ? বামুন-

বাড়ীতে ও মাছ কি কেউ খায়? তা বাবা, আমি হলুম মেয়েমানুষ, মুখ্যু,—তায় নেকাপড়া জানিনে; আমি অত কথা কি ক'রে জান্‌ব বল দেখি।"

তা'র মন রেখে বল্‌তে হল—"তা' ত বটেই।"

ক্যালার মার গাওনা আরম্ভ হয়েছিল বেশ খাদেই, কিন্তু ক্রমে গলা তা'র বেশ খেল্‌তে লেগেছিল, এইবার স্বরগ্রাম ছাড়িয়ে গেল। বল্‌লে—"তবে আমায় অমন যা'-তা' বলে কেন? আমি বুড়ো হয়েছি, ভীমরতি ধরেছে। তা হ্যাঁ গা, আমি এমনই কি বুড়ো হয়েছি? বল না।"

"তোর বয়স কত হ'ল?"

"সে আমি আর কি বল্‌ব বাবা, তোমরাই পাঁচজনে বল না।"

"কত আর হ'বে,—বাহাত্তর হ'বে বোধ হয়।"

বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে ক্যালার মা বল্‌লে—"সে ক' গণ্ডা হয় বাবা?"

"সে হয় গিয়ে—আঠারো গণ্ডা।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে একটু হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। বল্‌লে—"তবে? এখন ত বিশ গণ্ডাও হয়নি, তবে কেন বুড়ো বুড়ো করে বল্‌তে পার? আবার বলে ভীমরতি! আমার কি এখন ভীমরতির দশা? তোমরা ত সবাই দেখ্‌ছ,—বল না।"

তা'কে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম—"না না, ভীমরতির দশা হ'বে কেন,—তোর ত এখন বাহাত্তুরে দশা চল্‌ছে।"

একটু সহানুভূতি পেয়ে ক্যালার মার দুঃখ উথ্‌লে উঠ্‌ল। কাঁদো-কাঁদো সুরে আরম্ভ কর্‌লে—"তবে আমায় অমন সব কথা বলে কিসের লেগে? গরীব অনাথা বেওয়া পেয়ে—"

দেখ্‌লাম এইবার বেগতিক। এ রকম বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না আরম্ভ হ'লে, পরলোকগত ফ্যালার স্মৃতি এখনি জেগে উঠ্‌বে। তখন সাম্‌লানো দায় হ'বে। বল্‌লাম—"হ্যাঁ রে, সে শোল-মাছটা কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত ?"

বৃদ্ধার ফোক্‌লা মুখে সহসা একটা ফাঁকা হাসি ফুটে উঠ্‌ল ; বল্‌লে—"ওমা, সে আমায় দিয়ে দিলে যে গো ! হ্যাঁ, বল্‌লে—মাছ তুই খাস্‌ 'খন—নিয়ে যা। তা বাবা, আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে কাঁচা তেঁতুল দিয়ে অম্বল এঁধে খেলুম।"

তা'কে আর একটু উৎসাহ দিয়ে বল্‌লাম—"তবে ত বৌ-ঠা'ন তোকে খুব ভালবাসে বল্‌ ! আর সে যে রাগ করেছিল, সে কি আর সত্যি তোর ওপর ? নিজের স্বামীর ওপর—"

আহ্লাদে গ'লে গিয়ে ফ্যালার মা বল্‌লে—"হেঁ হেঁ তাই ত বলি, আমার ওপর রাগ কর্‌বে কিসের তরে ? আমাকে ভালবাসে খুব। এই যে আজ কত কি এঁধেছিল, কিছুই ত খায়নি, সব আমাকে এখন ধ'রে দিলে।"

বল্‌লাম—"ওঃ তবে ত তোর আজ পাথরে পাঁচ কিল ! তা এক কাজ কর্‌,—খাওয়া-দাওয়া ক'রে আজ রাত্তিরটা ওখানেই থাক। আমি বলে দিয়েছি তা' যেন বলিস্‌নি ; বল্‌বি দা'-ঠাকুর আজ বাড়ী আস্‌বে কিনা তা'র ত ঠিক নেই, পুরুষ-মানুষের রাগ, বলা ত যায় না ; তা তুমি বৌ মানুষ, রাত্তিরে একলাটি থাক্‌বে—বুঝ্‌লি ?"

বেশ খুসী হয়েই ফ্যালার মা চলে গেল।

পরের দিনটাও গোপালের আমাদের বাড়ীতেই কাট্‌ল। দিনটা কাট্‌ল, কিন্তু আর বুঝি কাটে না। সন্ধ্যার একটু আগে থেকেই সে উস্‌খুস্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। শেষে বল্‌লে—"লোচন, ভাই, আর কাজ নেই, চল এইবার বাড়ী যাওয়া যাক। রাগের মাথায় তখন চ'লে এলাম বটে, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি কাজটা ভাল হয়নি। হাজার হ'ক ছেলেমানুষ ত, অমন একলাটি ফেলে রাখা—"

আমি বল্‌লাম—"ও কথা এখন ভাব্‌ছ দাদা, কাল ত ভাবনি। তা যাই হ'ক, সে ভাবনা আর নেই,—তা'র ব্যবস্থা কালই হয়ে গেছে। তোমার বিন্দু-পিসী কাল থেকে ওখানেই রয়েছে। তা'ছাড়া, যার বাড়া নেই, ফ্যালার মা রয়েছে,—কোন ভাবনা নেই।"

গোপাল বল্‌লে—তা' হ'লেও—"

হেসে বল্‌লাম—"বুঝ্‌তে পারছি দাদা, কিন্তু তা' হলেও আজ আর কি ক'রে যাওয়া হয়? কাল গেলে না। আজকে যে আবার ত্র্যহস্পর্শ।"

ভ্রূ কুঁচ্‌কে গোপাল বল্‌লে—"আজ ত্র্যহস্পর্শ?…তা' হ'ক, নিজের বাড়ী যেতে আর দোষ কি?"

বল্‌লাম—"যা'বে ত অবশ্য নিজের বাড়ী। কিন্তু আমার বাড়ী ছেড়ে যা'বে ত—তা' কি ক'রে হয়?"

বামুন হ'লেও দাদার আমার শাস্ত্রজ্ঞান আমারই মতন! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে—"হ্যাঁ, সে কথাও ঠিক।"

সে হতাশ ভাবে চুপ ক'রে ব'সে রইল। এই করুণ দৃশ্য দেখে আমার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখা মুস্কিল হ'ল। কি একটা বাজে অছিলা ক'রে সেখান থেকে উঠে গেলাম।

টেঁপীর মাকে গিয়ে সব কথা বল্‌তে সে শুনে একটু হাস্‌ল। তা'রপর বল্‌লে—"তোমারও ইয়ে দেখে বাঁচিনে। যেতে চাইছে যাক না, তোমার তা'তে বগড়া দেওয়া কেন?"

বল্‌লাম—"হ্যাঁ, অত সহজেই ছেড়ে দিচ্ছি কিনা ওকে! বৌয়ের ওপর রাগ করার যে কি সুখ একটু বুঝুক। আমি বুঝি ব'লেই ত তোর ওপর রাগ করতে পারি না,—সাম্‌লে যাই।"

তার পরের দিন।

সকাল থেকেই গোপালের কেমন একটা উদাস বিমর্ষ ভাব। আমি কিন্তু যেন কিছু দে'খেও দেখ্‌লাম না। বাড়ী যা'বার কথা সেও কিছু বল্‌লে না, আমিও তুল্‌লাম না।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণের সেবার ব্যবস্থা হ'ল। ভাতের ফেন গাল্‌তে গাল্‌তে গোপাল বল্‌লে—"এ রকম রেঁধে খাওয়াও ঘোড়ার ডিম পোষায় না।"

টেঁপীর মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌লাম—"ঐ রোগেই ত পুরুষ জাতটা মরেছে দাদা! আমরা যা' পারি না, মেয়েরা সেটা পারে,—সেইজন্য ত ওদের এত গুমর। তোমারটিই বল আর আমারটিই বল, গুণে ঘাট নেই কারুর, ওরা সবাই সমান,—সব চারপেয়ের ধারাই এক!"

রান্নাঘরের দোরের দিকে একটু স'রে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লাম—টেঁপীর মা রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। মনে মনে বল্‌লাম, এখন ঐ নীরব আস্ফালনই সার, সরব প্রতিবাদের উপায় নেই; সেই সাহস পেয়ে আরো কি সব বল্‌তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আবার ভাব্‌লাম,

এখন না হয় পর্ব্বতের আড়ালে আছি; কিন্তু তার পর? না, এ আগুণ নিয়ে খেলা—বড় বিপজ্জনক। সাম্‌লে গেলাম।

গোপালকে বল্‌লাম—"কি আর হ'বে দাদা, এ-বেলাটা হাত পুড়িয়ে যা হ'ক ক'রে সেরে নাও। ও-বেলা তোমাকে স্বস্থানে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব 'খন। কিন্তু খরবদার, আর যেন কখন ভুলেও এমন ধাষ্টামো ক'রো না,—জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা কি চলে?"

সন্ধ্যার পরেই এস্‌রাজ হাতে ক'রে গোপালদা' শ্রীমতীর কুঞ্জে চল্‌লেন মান-ভঞ্জনের পালা গাইতে। আমাকেও বৃন্দা-দূতীর মতন সঙ্গে সঙ্গে যেতে হ'ল।

বাড়ীর সদর-দরজা বন্ধ ছিল, ফ্যালার মা খুলে দিলে। তা'র কাছে শোনা গেল, বিন্দু-পিসী বিকালে বাড়ী গেছেন, রাত্রে আবার আস্‌বেন। ফ্যালার মাকে ব'লে দিলাম—"তোর বামুন-পিসীকে তা'হলে গিয়ে খবর দিয়ে আয়। বল্‌ দা-ঠাকুর ঘরে এসেছে গো, তোমায় আর রাত্তিরে কষ্ট ক'রে যেতে হ'বে না।"

দাদার শোবার-ঘরের দরজা খোলা, ভিতরে আলো জল্‌ছে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানায় প'ড়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বৌ-দিদি বোধ হয় বিরহ-শয়নে প'ড়ে প'ড়ে পুর্ণিমার নিষ্ঠুর চাঁদকে কত কটু কথা শোনাচ্ছিলেন, আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে এসে দরজার পাশে দাঁড়া'লেন।

এস্‌রাজটিকে অতি সাবধানে এক পাশে রেখে দাদা গিয়ে বস্‌লেন বিছানার উপর। আমার আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকা দরকার মনে হ'ল না, তাই দরজার কাছ থেকেই সংক্ষেপে নিজের কাজ সেরে স'রে পড়্‌বার চেষ্টা।

বল্‌লাম—"'বৌ-দি', একাদশীর দিন ভক্তিভরে মাছ খেলেই বুঝি পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা হয়? আর স্বামীকে মার-ধর ক'রে তাড়িয়ে দিলে বুঝি কোন দোষ নেই?"

বৌ-দিদি বল্‌লেন—"ওমা আমি ওঁকে মেরেছি নাকি? মারিও নি, তাড়িয়েও দিইনি। উনিই বরং এস্‌রাজের ছড়িটা তুলে আমাকে মার্‌তে এসেছিলেন। অপরাধের মধ্যে আমি সেটা ধ'রে ফেলেছিলাম। তা ওটা যে অত পল্কা জিনিষ তা' কি জানি,—ধর্‌তেই মট্‌ ক'রে ভেঙ্গে গেল।"

মহা বিস্ময়ে দাদার দিকে ফিরে বল্‌লাম—"অ্যাঁ, সে কি! তুমি মার্‌তে গিয়েছিলে? বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে শেষে তোমাকেও সেই রোগে ধরেছে না কি—'সব সময়ে মনে থাকে না তবলা কি অবলা'? ছিছি!"

দাদা হেসে বল্‌লেন—"না না, পাগল হয়েছ! ও ছড়ি দিয়ে কখনও মারে, না মার্‌লেই লাগে?"

"আহা হা! লাগে কি না লাগে সে কথা ত হচ্ছে না, মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলাই যে বড় দোষের কথা,—সে হ'লেই বা নিজের স্ত্রী। আহা! অবলা, অবোলা, সরলা বালা—"

"হ্যাঁ, তা'র বোল শুনে শুনে কান ঝালাপালা,—আবার অবোলা!"

বুঝিয়ে বল্‌লাম—"সেটা কালের ধর্ম্ম দাদা, কি কর্‌বে বল। এটা হ'ল নারী-প্রগতির যুগ, জানই ত। সকল বিষয়েই নারী যে পুরুষের

সমান, সেটা প্রমান কর্‌বার জন্যে ওঁরা গাছ-কোমর বেঁধে লেগেছেন। গলাবাজিতে বাঙ্গালী পুরুষ এতদিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, এঁরা এখন তা'র ওপর টেক্কা দিয়েছেন। পুরুষ যদি এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেয়, বঙ্গনারী দেবেন ঝাড়া দু'ঘণ্টা!"

দু'জনেই চুপচাপ। কেউ আর কিছু বলে না। অথচ মনে হ'ল, দু'জনের চোখে-চোখে কি যেন বেতার-বার্ত্তার বিনিময় চল্‌ছে। বুঝ্‌লাম, যে দাম্পত্য বিবাদের বিচার কর্‌বার জন্যে কাজী সেজে এসেছিলাম, সে বিবাদ আর নেই। কাজীর কাজ ফুরিয়েছে, সুতরাং কাজী এখন—

যাক, উপস্থিত মানে-মানে বিদায় হ'তে পার্‌লে বাঁচি! পায়ে-পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বল্‌লাম—"সে যাই হ'ক, নারী যদি আজ অবোলা না-ও হয় অবলা ত বটেই,—তা'তে ত কোন সন্দেহ নেই। নারী-প্রগতির যিনি যত বড়ই পাণ্ডা—থুড়ি, পাণ্ডানী—হ'ন না কেন, তাঁ'কেও স্বীকার পেতে হ'বে যে পুরুষের কাছে নারী মাত্রেই অবলা।"

দাদা বল্‌লেন—"সে হিসাবে অবলা নিশ্চয়ই। তবে কি না এ ক্ষেত্রে অবলাটি হচ্ছেন—কাবুলী অবলা!"

আমি তৎক্ষণে দরজার চৌকাট ডিঙ্গিয়ে রোয়াকে এসে পড়েছি। দাদার রসিকতা শুনে একটু হেসে ফিরে চাইতেই দেখি—দরজাটা ইতি-মধ্যে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে!